শুকতারা

স্বর্ণখনির অন্তরালে

পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র · ১৩৯৯

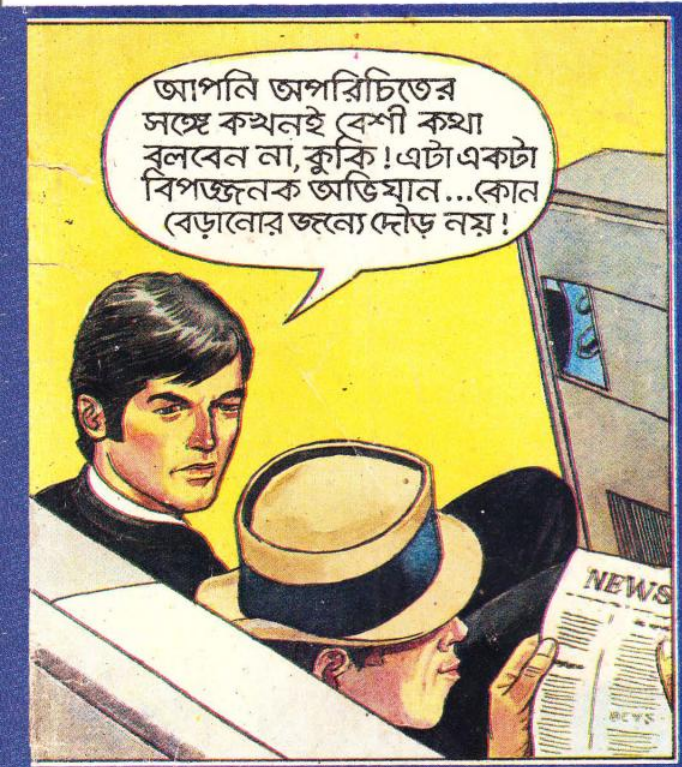

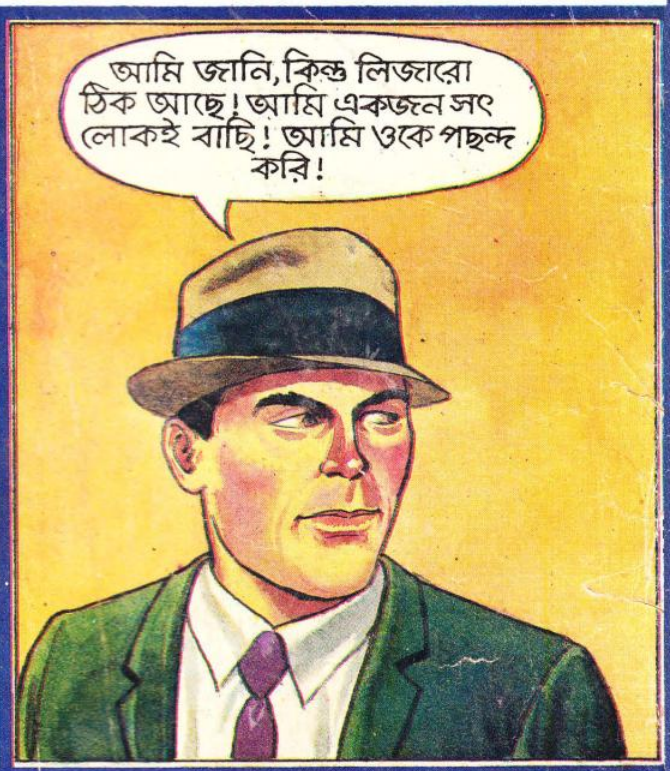

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - হরিদাস পাল

স্ক্যান করেছেন - হরিদাস পাল

এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

উ-উ-উঃ,ইল্লি,বাহ,আহ
উঃ-কি-উঁচু
কেবল্ কার
সোঁ-ও-ও-ও—
হু-উ-উ-শ
মুনরেকার
ওরেব্বাস,হুস্-হুস্
ঝপাং-ঝপাং-ও আরো-কত-কিতে ভরা একশ মজার রাজ্য
ঝপ্-ঝপাং ওয়াটার শ্যুট
কু-ঝিক্-ঝিক্
টয় ট্রেন
ধড়াম্-ধুড়ুম্
স্ট্রাইকিং কার
HTA 4616
মাথা ভোঁ-ভোঁ করা টুইস্ট্-আ-ওয়ার্ল। ফুটফুটে জাপানী বাগান। মন-গলানো চকোলেট। হুশ্-হুশ্ প্যাডল্ বোট। লেইজি রিভার রাইড। গরমাগরম ঘুঘনি। শেরুহিল্ থেকে চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। আর জিভে-জল-আনা খাবারে ভর্তি ফুডকোর্ট। নিকো পার্ক। এক্কেবারে মজায় ঠাসা।
NiCCO PARK
মজায় যেন গর্জে ওঠে

বাঁটুল দি গ্রেট

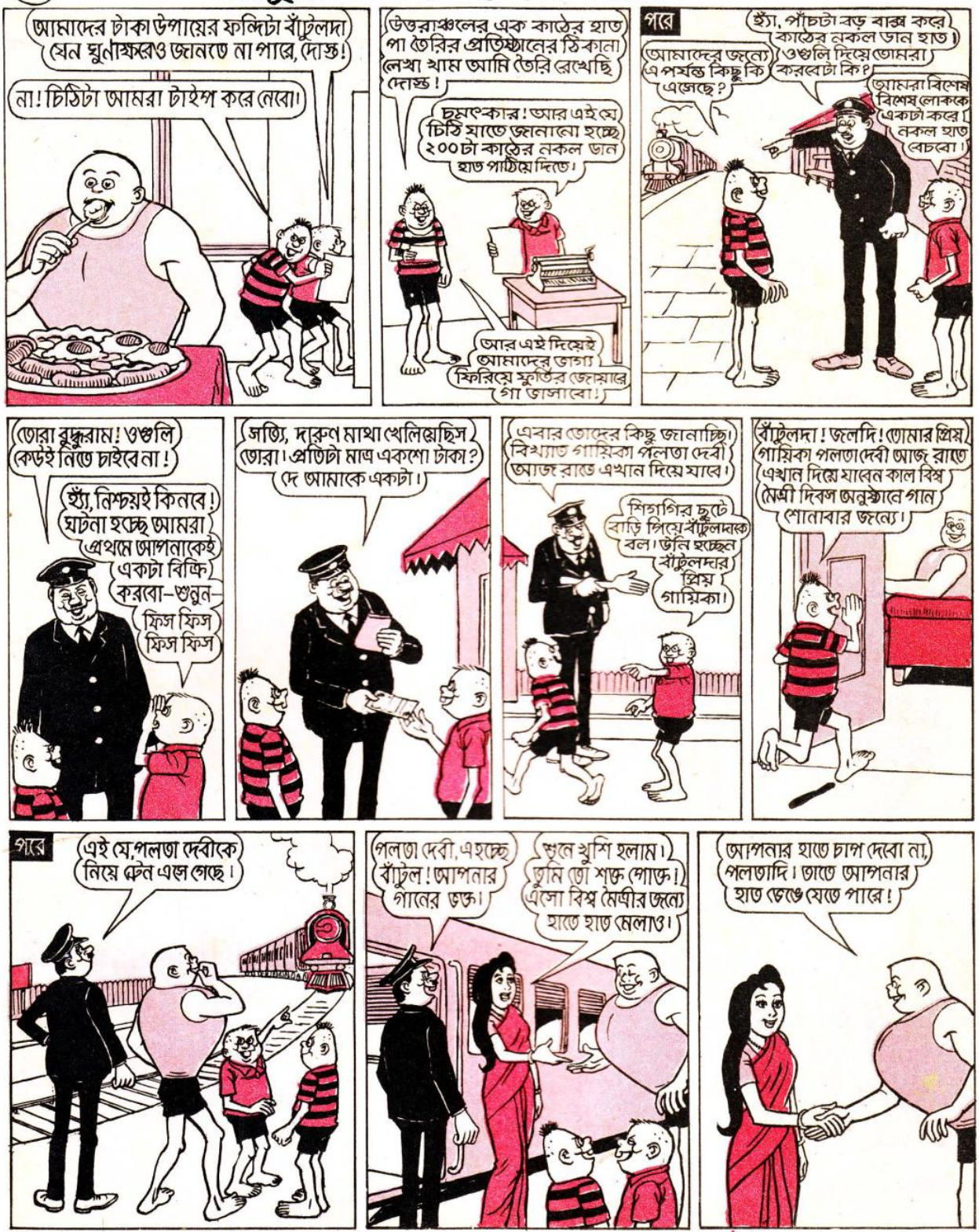

Suk—Aug 1

পলতাদি আমার ডান হাত ধরেছিলো! ওর স্মৃতি হিসেবে আমি এই হাতে কাল পর্যন্ত কিছু করবো না!
পরদিন
আসুন, হাতে হাত মেলান, টেঙ্কুবাবু! সারা বিশ্বের মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় হোক!
বিশ্ব মৈত্রী দিবসে হাতে হাত মেলাও, দোস্ত!
হাতে হাত মেলাও, বাঁটুল।
আমিও বাঁটুলের সঙ্গে মেলাবো।
তাজ্জব! সবাই দেখছি এখন আমার সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে! এমনিতে আমার হাতকে ওরা ভয়ে এড়িয়ে চলে।
কিন্তু যে হাতে পলতাদি হাত মিলিয়েছিলো সে হাতে মেলাবো না!
বাঁ হাত মেলান, হাঁকুবাবু!
ওরে গেছি রে!
ওওঃ! বাঁটুল আমার বাঁ হাতের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!
ছোঁড়াদুটোর ভড়কিতে বাঁটুলকে অবাক করার জন্যে ওদের কাছ থেকে নকল ডান হাত কিনলাম— আর এখন বাঁটুল বাঁ হাত মেলাচ্ছে!
এককেটা নকল ডান হাত একশো টাকায় বেচে আমাদের কাত করে বিচ্ছু ছোঁড়াদুটো গেলো কোথায়?
তেড়ে দৌড়ো, দোস্ত! নকল হাত বেচার জন্যে পুরো এলাকা আমাদের তাড়া করেছে।
হতচ্ছাড়া বাঁটলো ভুল হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের ধাত ছাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলো!
লোকালয়ের বাইরে এক নির্জন স্থানে
বিশ্ব মৈত্রী দিবসকে ভাঙিয়ে বেশ কিছু মাল হাতিয়েছি! কিন্তু খরচ করার জন্যে এলাকায় যাবার উপায় নেই!
এখন এই টাকার কোন দাম নেই। এ দিয়ে কোন কাম হবে না। তার চেয়ে চল নাকে খৎ দিয়ে টাকা ফেরত দিয়ে দিই।

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

ভাদ্র ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২

প্রচ্ছদ □

স্বর্ণখনির অন্তরালে—নারায়ণ দেবনাথ

ধারাবাহিক □

রক্তসরার দ্বীপ (উপন্যাস)
—রমেন দাস ৪৪০

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনী □

প্রেতপিশাচের অভিশাপ
—অসিত মৈত্র ৪৮৫

গল্প □

বাঘের নেশা—গোরাচাঁদ পাল ৪৫২
জানবে না কেউ—বিশ্বরঞ্জন দাস ৪৮৪

উপকথা □

খেল খতম—উৎপল চৌধুরী ৪৩৮

ভূতের গল্প □

দুঃখীরাম শান্তিরাম
—মণিলাল মুখোপাধ্যায় ৪৪৫

হাসির গল্প □

সাবধানের মার—অনিশা দত্ত ৪৫৪

অনুবাদ গল্প □

খোলা জানালা
—প্রসেনজিৎ সরকার ৪৭৯

পুরাণের গল্প □

বিশ্বকর্মার কাণ্ডকারখানা
—নন্দলাল ভট্টাচার্য ৪৫৬

জীবন থেকে নেওয়া □

ককেশাশের কোলা—আরতি বসু ৫০২

পুরস্কৃত গল্প □

আমার মা (প্রথম)
—নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত ৫০০
মায়ের জন্যে (দ্বিতীয়)
—রেবা ঘোষ ৫০০

অগ্নিযুগের সৈনিক □

বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো
—চরণ দাস ৪৬২

ফিচার □

প্রাণী হত্যায় হিতে বিপরীত
—পথিক মণ্ডল ৪৫৯
কলকাতায় জল সরবরাহ
—বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮১

বিজ্ঞান বিচিত্রা □

বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪৬৮

কবিতা □

দুগ্গা আসেন—সৌমেন্দু সামন্ত ৪৩৭

বিভাগীয় লেখা □

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭০
ক্লাব পরিচিতি—সুমন ভট্টাচার্য ৪৭৬
পড়ার সঙ্গে খেলা
—বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭৭
শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৪৭৮
দাদুমণির চিঠি ৪৬৪
তোমাদের পাতা ৪৬৫
মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৪৯৫

ছবিতে গল্প □

ভেলকির খেলা—ময়ূখ চৌধুরী ৪৬৯
বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ৪৩৩
বাহাদুর বেড়াল (রঙিন)
—নারায়ণ দেবনাথ ৪৬৭
হাঁদা-ভোঁদা—নারায়ণ দেবনাথ ৪৯৮
বিলির বুট (রঙিন) ৪৫০
ছদ্মবেশে ম্যাম'জেল এক্স ৪৮২

ঘোষণা □

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি
সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫০১

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456 (17)-T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য - হাতে নিলে ৯০ টাকা। ডাকেঃ বুক পোস্টে - ১১০টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ১৭০ টাকা।

Annual Subscription
Bangladesh— **Rs. 235.00**
U.K. and U.S.A.— **By Sea Mail Rs. 327.00**
By Air Mail Rs. 552.00

R.N.I.
Registration No. 2621/57

দামঃ ৮ টাকা মাত্র

কমপ্লান কমাণ্ডোস

দুর্ধর্ষরা এসে পড়লো!

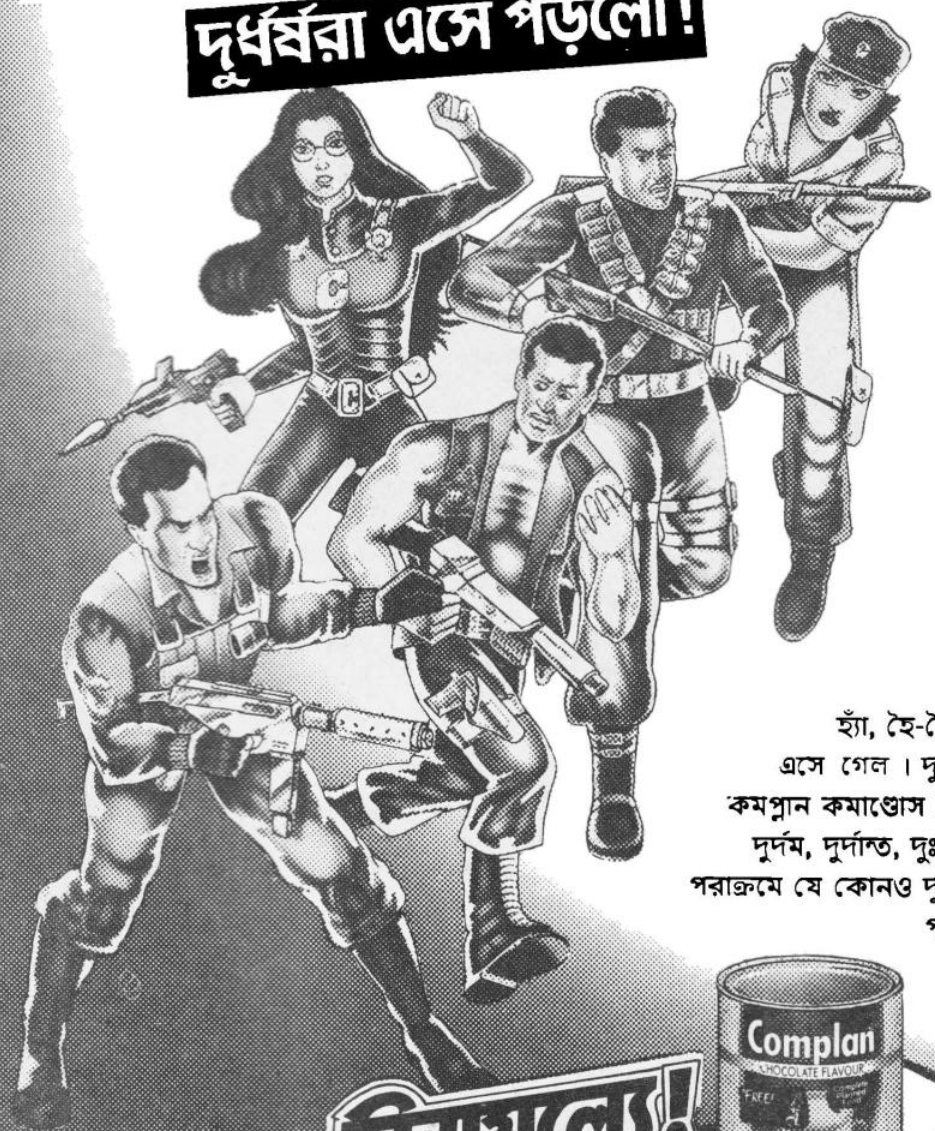

হ্যাঁ, হৈ-চৈ ফেলে এসে গেল। দুর্ধর্ষ পাঁচ কমপ্লান কমাণ্ডোস। এইসব দুর্দম, দুর্দান্ত, দুঃসাহসীর পরাক্রমে যে কোনও দুষ্ট হবে পরাভূত।

বিনামূল্যে!

একটি কমপ্লান কমাণ্ডো (পুতুল),
প্রতি ১ কিলোর চকোলেট প্যাকের সাথে।

23 সুস্বাদুকরিত মাত্রায়, ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

বর্তমানে নির্ধারিত বাজারগুলিতেই পাবেন।

GX/75/203 BEN R1

শুকতারা

৪৫শ বর্ষ ● ৭ম সংখ্যা ● ভাদ্র ১৩৯৯/আগস্ট ১৯৯২

দুগ্‌গা আসেন

সৌমেন্দু সামন্ত

দেউলপোতায় কাশ ভরে যায়
কাঁসর বাজে কোথা ?
কাঁসর বাজে মন্ডপে 'দ্রিম'
নেইকো নীরবতা ।

কুড়-তা-নাকুড় ঢোলক, ঢুলীর
নাচন ডাইনে, বাঁয়ে,
শিউলি ফুলের রঙ ছেয়ে যায়
অঙ্গনাদের গাঁয়ে ।

মেঘের ভাসান আকাশ সাজায়
সূর্যিকে দেয় আড়ি,
সপরিবার মা দুগ্‌গা
আসেন বাপের বাড়ি ।

ছবি : অমল চক্রবর্তী

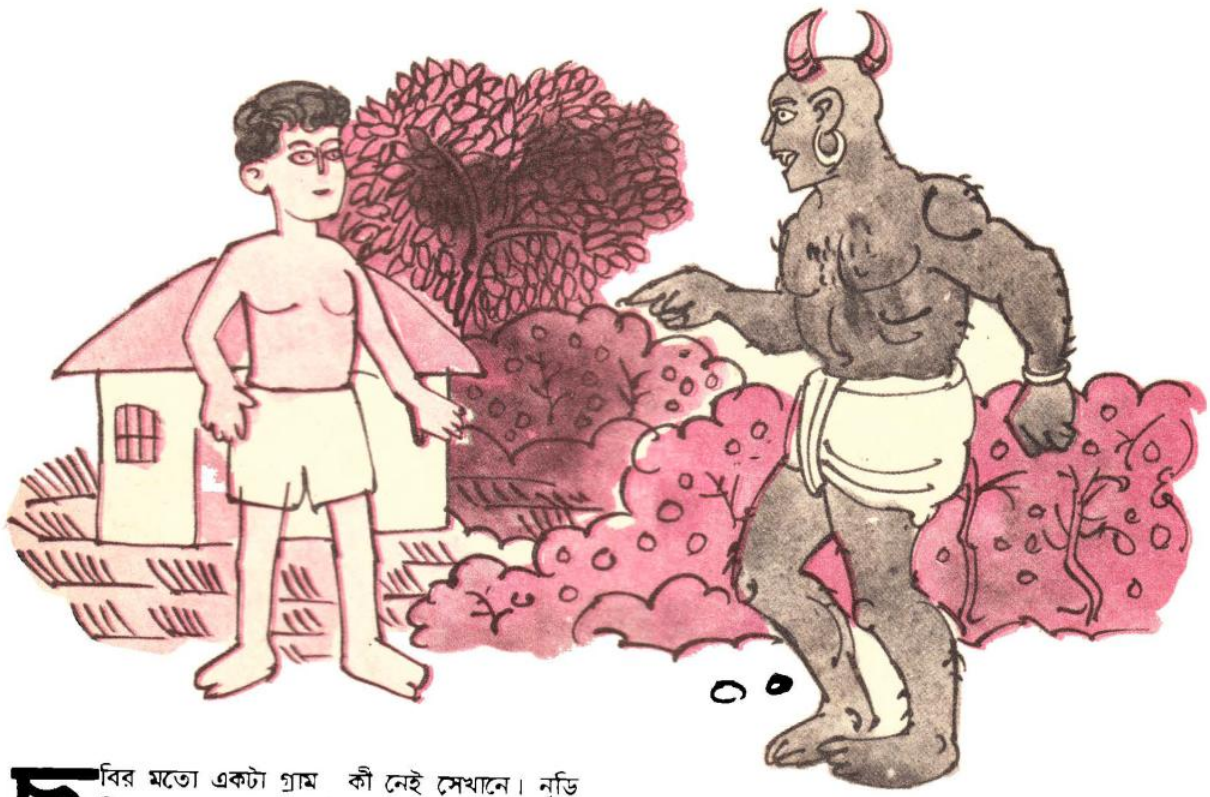

খেল খতম

উৎপল চৌধুরী

ছবির মতো একটা গ্রাম কী নেই সেখানে। নুড়ি বিছানো পথের পাশ ঘেঁষে আপন মনে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট নদী। পুকুরের টলটলে জলে খেলে বেড়াচ্ছে রূপোলী মাছের ঝাঁক। মাঠভর্তি রাজ্যের ফসল। সোনালী ধানের শিষ বাতাসে দোলাচ্ছে মাথা। যেন বেণী দোলাচ্ছে কচি মেয়ের দল। আবার পাশেই দেখ সবুজের সমারোহ। আনাজের খেত। এসব দেখে কেউ টের পাবে না বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের মানুষজন কী ভীষণ চিন্তিত।

চিন্তার কারণ আছে বৈকি। ঘটনাটা ঘটছে পরপর বেশ কয়েকটা দিন ধরেই। যেই না বিকেল গড়িয়ে নামছে সন্ধ্যা অমনি কে বা কারা চুপিচুপি হানা দিচ্ছে গৃহস্থের গোয়ালে। আর একটা একটা করে খেয়ে যাচ্ছে গরু ছাগল-ভেড়া। বাদ নেই কিছুই। শান্তি নেই তাই লোকের মনে। দিন দিন বাড়ছে শঙ্কা বাড়ছে সংশয়

একদিন পঞ্চায়েত বসল গ্রামের হাটতলায়। কিছু একটা করা দরকার তা না হলে নিস্তার পাবে না কেউই । ঠিক হলো, পালা করে সন্ধ্যার পর গো শালার আশপাশে টহল দিতে হবে তবে খুব সন্তর্পণে। কেউ যেন বুঝতে না পারে নজর রাখা হচ্ছে কেননা এই সাংঘাতিক কাণ্ডের নায়ক কে, সেটা আগে জানা দরকার। এটা যে সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়, সেটা বুঝতে কারোর বাকি নেই।

একদিন রাতে সত্যি-সত্যিই ধরা পড়ে গেল এতো কাণ্ডের নায়ক। সেটা একটা দৈত্য। কোনোক্রমে সে যাত্রায় টানা-হেঁচড়া করে সে পালিয়ে বাঁচল। পরদিন সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে গেল খবরটা। গ্রামের মানুষ আরও সজাগ হয়ে গেল। সন্ধ্যা নামলেই বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে তারা দা, বল্লম, বাঁশের বড় বড় লাঠি নিয়ে তৈরি হয়ে দৈত্যের অপেক্ষায় রইল। দু'একটা দিন বেশ শান্তিতেই কাটল। তখন সবাই ধরে নিল ভয়ে আপদটা গ্রামছাড়া হয়েছে। তাই বলে পাহারা দেওয়া

বন্ধ হলো না। কারণ সাবধানের মার নেই।

দৈত্যটা কিন্তু আবারও এল একদিন রাতে। যারা পাহারায় ছিল তারা দেখল দৈত্যটা চুপিচুপি ঢুকছে একটা গোয়ালঘরে। তারাও কিছু না বলে দৈত্যটাকে গোয়ালে ঢুকতে দিল। এরপরই উঠল গরু-ছাগলের দাপাদাপি আর চিৎকার। পাহারাদার গ্রামবাসীরা গোয়ালটাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল আর দৈত্যটাকে লাঠি, বল্লম, দা দিয়ে পিটতে থাকল। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে দৈত্যটা ক্রমশ বড় হতে থাকল। তার গায়ে যতই আঘাত পড়ে ততই বিশালকায় হতে থাকে সে। গ্রামবাসীরা অবাক হলেও দৈত্যটার উপর আঘাত বন্ধ হলো না। তারা মেরেই শেষ করতে চায় শয়তানটাকে।

অবশেষে বেগতিক দেখে দৈত্যটা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা ছাড়ল না। তারাও ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল দৈত্যটার পিছুপিছু। আর অবাক কান্ড! দৈত্যটা যতই ছোটে ততই তার আকৃতি ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে।

এই গাঁয়েরই একেবারে শেষপ্রান্তে একটা জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরে বাস করত এক অনাথ বালক। আত্মীয় বলতে তার কেউই ছিল না। এব ওর ফাইফরমাস খেটে সে যা পেত, তাই দিয়েই সে কোনোক্রমে সংসার চালাত। এত হাঁক-ডাক আর চিৎকারে সে বেরিয়ে এল কুঁড়ের বাইরে। আর তখনই দৈত্যটা হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে এসে বলল, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বাঁচাও আমাকে। চটপট তোমার মুখটা হাঁ কর, আমি একটা মাছি হয়ে ঢুকে যাই।'

এই কথা শুনে ছেলেটি এতই অবাক আর হতভম্ব হয়ে গেল যে সে না চাইলেও আপনা-আপনি তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল আর এই মোক্ষম সুযোগে দৈত্যটা মাছি হয়ে ঢুকে গেল তার মুখে। তারপর সটান আশ্রয় নিল তার পেটের মধ্যে।

এদিকে গ্রামবাসীরা দৈত্যটার আর কোনো হদিস না পেয়ে মন খারাপ করে ফিরে গেল যে যার ঘরে। বালকটি তখন দৈত্যের উদ্দেশে বলল, 'এবার তুমি বেরিয়ে এস।' দৈত্য তাতে রাজী হয় না কিছুতেই।

বালকটি তখন বলল, 'সবাই চলে গেছে। এবার বেরিয়ে এসো। কোনো ভয় নেই।'

দুষ্টু দৈত্যটা জবাব দিল, 'তোমার খাদ্যথলিটা বড়ই সুন্দর আর নিরাপদ। এখানে কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া তুমি যা খাবে আমি পরিশ্রম না করেই তা খেতে পাব। এমন আরাম কি ছাড়া যায়। ক্ষেপেছ তুমি!'

বালকটি দেখল এ তো মহা বিপদ। একে তার ঠিকমতো খাবারই জোটে না। এরপর তার খাবারটা যদি দৈত্যটা খেয়ে নেয় তাহলে সে তো মারা পড়বে অচিরেই। বালকটি ভয় পেল না। মনকে শক্ত করে সে গেল তার পরিচিত এক ওঝার কাছে। চুপিচুপি ঘটনাটা তাকে বুঝিয়ে বলল।

দৌড়তে লাগল দৈত্যর পিছুপিছু

ওঝা বলল, 'তুমি ভয় পেও না। অপেক্ষা কর একটুখানি', বলে ওঝা ঢুকে গেল তার ঘরে।

কিছুক্ষণ পরই সে বেরিয়ে এল হাতে একটা ছোট্ট বাটি নিয়ে। তাতে ছিল খুব কড়া একটা ওষুধ। ওঝারা তো ভূত-প্রেত তাড়ায় তাই কত ওষুধ তাদের জানা থাকে। বাটিটা বালকটিকে দিয়ে ওঝা বলল, 'এক চুমুকে খেয়ে ফেল। দৈত্যের দফা রফা হবে।'

বালকটি ওঝার কথামতো এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলল ওষুধটা। বাস আর যায় কোথায়! তার পেটের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে মরে গেল দৈত্যটা। বালকটিও মহানন্দে ফিরে গেল তার ঘরে।

ছবি: বিজন কর্মকার

রক্তসরার দ্বীপ

রমেন দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নাটকের দর্শকরা উৎকণ্ঠায় অধীর। অভির বুক কাঁপছে। অর্জুন ডাক্তার পাথরের মূর্তির মতো রঙ্গমঞ্চের দুই নায়কের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখছেন। কতক্ষণ, সময়ের হিসাব নেই অভির। মনে হলো অনন্তকাল ধরে অরণ্যের হিংস্রতার সঙ্গে বুদ্ধিমান মানুষের এই অন্তহীন সংগ্রাম চলছে, চলেছে–চলবে।

অবশেষে সাপটা ছোবল দিল। যেন একটা কালবৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়ল। ভয়ে চোখ বন্ধ করল অভি।

ভয় পেলে দাদাবাবু? ত্রিলোচনের সহজ গলার আশ্বাসের সুরে অভি চোখ খুলে দেখল, সেই ভয়ংকর বিষধর সাপটা তিলুদার হাতের মুঠোয় বন্দী। আক্রোশে হতাশায় শরীরের শেষাংশ দিয়ে ত্রিলোচনের ডান হাতটা জড়িয়ে ফেলে নাগরাজ। কিন্তু বেচারার আর কোনো কিছু করার নেই।

ওয়ান্ডারফুল, হাততালি দিয়ে উঠলেন ডাক্তার অর্জুন বাঁড়ুয্যে। বললেন, সত্যি তোমার তুলনা নেই ত্রিলোচন।

এই বোটে এখন একমাত্র নায়ক ত্রিলোচন মাল। পেশীবহুল কালো চেহারা নিয়ে নৌকার ছাদে দাঁড়িয়ে সে। দুরন্ত গোখরোটা তার হাতের মুঠোয়। চোখ দুটি জ্বলছে। শ্বাস পড়ছে ঘনঘন।

সাপটাকে কি করবে তিলুদা? অভির প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু অনুমতি দিলে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ত্রিলোচন বলল, এত বড় সাপ সহসা চোখে পড়ে না। কলকাতায় কলেজে দিলে ডাক্তাররা লুফে নেবেন।

নেবে কি করে? ডাক্তারের প্রশ্ন।

আজ্ঞে, ঝাঁপি আছে, সবিনয়ে জানায় ত্রিলোচন।

দেখো বিষদাঁত ভাঙা হয়নি। খুব সাবধান ত্রিলোচন। সতর্ক করলেন অর্জুন ডাক্তার।

আজ্ঞে কাল সকালে বিষদাঁত ভাঙব, বিষ ছাড়াব। আজ মন মেজাজ খারাপ, আজ থাক। বলল ত্রিলোচন।

কলেজে সাপ দিয়ে কী হয় কাকু? অভি প্রশ্ন করে।

এ কলেজ তোদের কলেজ নয় রে, হাসলেন অর্জুন ডাক্তার, এ হচ্ছে মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজ ছাড়া অনেক ওষুধের কারখানাও সাপ কেনে বিষের জন্য।

বিষ? বিষ দিয়ে কী করে ওরা?

নানান মারাত্মক ওষুধ তৈরি হয় সাপের বিষ দিয়ে, বলেন অর্জুন ডাক্তার। সর্পবিষ চিকিৎসার সিরাম তো সাপের বিষ থেকেই। কথায় বলে না, বিষে বিষক্ষয়। এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার ব্যাপারেও সাপের বিষ ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

বিষস্য বিষৌষধম—ছোটবেলায় পড়া সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল অভির। বিষ দিয়ে বিষের চিকিৎসা। মানুষ কোনো কিছুকে অবহেলা করে না বলেই তো মানুষ! মৃত্যুকে অমৃত করতে পারে বলেই মানুষের কাছে আজ অরণ্যের হিংস্র প্রাণীরাও বশীভূত। তাই ত্রিলোচন মালের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয় মহাবিষধর কালফণী।

॥ নয় ॥

খাল এখানে বেশ চওড়া। গভীরতাও যথেষ্ট। দু'পাশের অরণ্য সরে গেছে অনেকটা দূরে। বিপদের আশংকা নেই বুঝে দলটি আবার ছাদে উঠে এসেছে।

সাত নম্বর লাট ডানদিকে। অভির চোখ হরিণ খুঁজছে। বেশ কিছুক্ষণ হলো হরিণের দেখা মিলছে না। পাড় দূরে হলেও দৃষ্টির আওতার বাইরে নয়।

সহসা অর্জুন ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। ত্রিলোচন ওটা কী বস্তু হে? ত্রিলোচনও বৈঠা হাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, হুঁশিয়ার বাবু, আপনারা কামরার ভেতরে যান। বাবা দক্ষিণ রায় ওপার থেকে সাঁতরে এপারে আসছে।

বাঘ খাল সাঁতরে ওপার এপার করছে! দারুণ ব্যাপার তো! কামরার দরজা বন্ধ করে বসে এই দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ হারাতে অভি কিংবা গংগা—কেউই রাজী নয়।

পাগলামিতে অর্জুন ডাক্তারও কম যান না। তিনি বললেন, প্রায় দু'শো হাত দূরে আছে ব্যাটা, দেখি না কী করে।

জোয়ারের স্রোত ঠেলে বাঘটা ভেসে চলেছে। জলের ওপর ভাসছে ওর মাথাটা। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত সে। কাছেই যে নৌকাভর্তি কটা মানুষ তার দিকে চেয়ে আছে, সেদিকে আপাতত হুঁশ নেই। প্রায় কোনাকুনি সাঁতরে বাঘটা পাড়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এমন সময় জলের ভেতর প্রবল আলোড়ন।

উত্তেজনায় নৌকার সবাই চঞ্চল।

এবার আসল সুন্দরবন দেখবেন বাবু। বলল বৃন্দাবন। কথায় বলে না, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ! বাঘে-কুমীরের লড়াই এবার প্রত্যক্ষ করুন আজ্ঞে।

লড়াই বটে। বাঘটা উঠে গেছে কর্দমাক্ত বেলাভূমিতে। তার একটা পা কুমীরের চোয়ালের জাঁতাকলে আটকা। প্রবল গর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘুরে থাবা চালাচ্ছে বাঘ। প্রতিবাদে কুমীরের প্রকাণ্ড লেজটা আছড়ে পড়ছে বাঘের শরীরে। কখনো বাঘটা কুমীরকে টেনে নিয়ে উপরে উঠছে, আবার পরক্ষণেই কুমীর টেনে নামাচ্ছে শিকারকে জলের ভেতর।

বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে কটা অবাক মানুষ বিস্ময়ে হতবাক। প্রকৃতির লীলানিকেতনে দুই হিংস্র প্রাণীর মরণপণ সংগ্রামের কৌতূহলী দর্শক। বোঝা যাচ্ছে, বাঘটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। হয়তো দীর্ঘকাল পেট পুরে খাওয়াও জোটেনি। হয়তো বয়সের ভারে অশক্ত হয়ে পড়েছে। তবুও কী তার তেজ, কী তার দাপট! পেছনের দিকে যে পা-টা কুমীরের মুখে, সেটা তো জাঁতাকলে আটকা। সামনের দুটো থাবায় বারবার আক্রমণ করে চলেছে কুমীরকে। কাদা জল ছিটকে ছিটকে উঠছে। চাপা একটা গর্জন! শেষবারের মতো সমস্ত শরীর দিয়ে কুমীরটার আগ্রাসী কামড় থেকে পা ছাড়াবার চেষ্টা। কুমীরের লেজের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল বিরাট বাঘটা। মাঝ নদীতে শুধু একবার কুমীরের চোয়ালে আটকানো বাঘের ডোরাকাটা শরীরটার কিছু অংশ দেখিয়ে ডুব দিল কুমীরটা। আর জলের তলা থেকে উঠে এল কিছু বুদবুদ জলটা সামান্য রাঙা হয়ে আবার নিজস্ব রূপ ধারণ করল

কার জন্য দুঃখ করবে অভি? এই গভীর অরণ্যে বেঁচে থাকার এই তো নিয়ম। হয় মারো, নয়তো মরো। তবু বাঘটার জন্য অদ্ভুত বেদনা বোধ হচ্ছে অভির।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, বললেন অর্জুন ডাক্তার, পৃথিবীর সেরা শিকারীদের ভাগ্যেও এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ বড় বেশি আসে না। সেদিক থেকে আমরা খুবই ভাগ্যবান।

রাত্রি গভীর হলো। নদীতে আর নেই সেই স্রোতের উদ্দামতা শ্রান্ত অভিযাত্রীরা সকলেই শুয়ে পড়েছে। ভেতরে শুধু গংগা জেগে। সহসা বাইরে একটা শব্দ। চমকে উঠল গংগা।

তিলুদা, ডাক্তারবাবু, গংগা চাপা গলায় ডাকল।

উঠে বসলেন অর্জুন ডাক্তার। অভিরও ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কারা যেন কথা বলছে, বলল গংগা।

হাঁ, বাইরে সত্যি মানুষের গলা। এক আধজন নয়—কয়েকজনের

দরজা খোল্, বাইরে থেকে একটা কর্কশ গলা ভেসে এল।

কে তোমরা, কি চাও? অর্জুন ডাক্তার ভেতর থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

আরে দরজা খোল্—নইলে তোদের বাহারি বোট জলে ডুবিয়ে দেব, কর্কশ গলায় এবার হুকুম এল।

এটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোট, তোমরা যেই হও চলে যাও এখান থেকে। আমাদের সংগে কোনো টাকাকড়ি নেই, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

আছে কি নেই, সে আমরা দেখব। এই কুড়োল দিয়ে দরজাটা ভেঙে ফেল্ তো। কর্কশ কণ্ঠ ভয়ংকর হয়ে উঠল।

দরজা ভাঙতে হবে না—আমরাই দরজা খুলে দিচ্ছি, বললেন অর্জুন ডাক্তার।—গংগা দরজা খুলে দে।

পাংশু মুখে গংগা দরজা খুলে দিতেই দুটো লোক কামরার

তোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব।

মধ্যে ঢুকে পড়ল। চোদ্দ বত্তির একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ঝলমল করে উঠল সেই আলোয় ওদের হাতে ধরা দুটো ভোজালি ঝিলিক দিয়ে উঠল

প্রাণে বাঁচতে চাইলে ঘরে কাছে যা আছে দিয়ে দাও, নির্দেশ দিল ওদের একজন। বোঝা গেল সে-ই দলের সর্দার।

বলেছি তো আমাদের কাছে কিছু নেই, আমরা কজনে মিলে সুন্দরবন দেখতে বেরিয়েছি, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

চালাকি করলে ফল ভাল হবে না লোকটা আবার হুঙ্কার দিল। তারপর ওর চোখ পড়ল অভির দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কিছু নেই—না? দেখছি কিছু আছে কিনা। এই ছেলেটা এদিকে আয়। আয় বলছি!

অভি একবার ডাক্তারকাকুর মুখের দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে যায় ডাকাত সর্দারের দিকে

হাতের ভোজালিটা অভির গলায় ঠেকিয়ে লোকটা বিকট স্বরে বলল, মালকড়ি কার কাছে কি আছে সব তুলে না দিলে এই ভোজালি ওর গলায় বসবে তোরই তো ছেলে মনে হচ্ছে!

ভুল মনে হচ্ছে, অকম্পিত গলায় উত্তর দিলেন অর্জুন ডাক্তার। ও আমার ছেলের চাইতেও বড়। তবে ওর গলায় ছুরি বসালেও এ বোটে যা নেই তা তোমাদের দেব কোত্থেকে?

অকথ্য গাল দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টানে ডাক্তারের হাতের ঘড়িটা ছিনিয়ে নিল। তারপর চীৎকার করে উঠল, ভাল করে খুঁজে দেখ কী মালকড়ি আছে নৌকায়। কেউ বাধা দিলে কেটে জলে ভাসিয়ে দিবি। নৌকার পাটাতনগুলোও তুলে দেখবি।

অভির গলার কাছে ভোজালির ডগা। তিনজন ওদের জিনিসপত্র হাতড়াচ্ছে। একজন তুলে নিয়েছে ডাক্তারের দূরবীন। ত্রিলোচন-গুণধর অসহায়ের মতো বসে বসে ফুঁসছে। গংগার হাতটা শুধু একটু একটু করে এগুচ্ছে গুলতির দিকে। অর্জুন ডাক্তারের মুখ যেন গ্রানাইট পাথর!

এই ব্যাগটা পাওয়া গেল সর্দার, অর্জুন ডাক্তারের মানি ব্যাগটা নিয়ে একজন এগিয়ে এল।

কত আছে? সর্দারের প্রশ্ন।

কষ্ট করে গুনবে কেন, আমিই বলে দিচ্ছি—তিনশ তেতাল্লিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন অর্জুন ডাক্তার। এ টাকায় তোমাদের পড়তাই পোষাবে না।

চুপ! গর্জে উঠল সর্দার। বলল, আরো আছে, নিশ্চয়ই আছে। বের কর শীগগির। নইলে তোর এই সোহাগের ছেলের....

কথাটা শেষ করতে পারল না ডাকাত সর্দার। তার আগেই রান্নাঘরের দরজার কাছ থেকে বৃন্দাবনের গলা ভেসে এল। চীৎকার করে বলে উঠল, নিকুঞ্জ গোলদার হাতের ভোজালি ফেলে দে নইলে এই বন্দুকের গুলিতে তোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলব।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ডাকাত সর্দার। এক পায়ে দেয়ালে ভর দিয়ে বন্দুক তাক্ করে যে লোকটা তাকে হাতের ভোজালি ফেলে দিতে বলছে, কে সে?

নোঙরের দড়ি দিয়ে সব কটাকে বেঁধে ফেল তিলু, গুণধর। গংগা তুইও বসে থাকিস না। আমি বন্দুক তাক্ করে আছি, বিজ্ঞ সেনাপতির মতো বলল বৃন্দাবন গায়েন।

নিকুঞ্জ গোলদারের হাত থেকে ভোজালি খসে পড়ল। ডাকাতসর্দারের অন্য দুই সংগীও হাতিয়ার ফেলে এক ঠায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু আরেক সংগী গেল কোথায়? নৌকার পাটাতন তুলে তন্নতন্ন করে বোধহয় চতুর্থ ডাকাত মালপত্রের সন্ধান করছিল। আচমকা এক চীৎকার, নিকুঞ্জদা, কালনাগের দংশন গো—কালনাগ!

হতভাগ্য এই ডাকাত নৌকার খোল থেকে টেনে বার

করছিল ত্রিলোচনের সদাধরা গোখরো সাপের ঝাঁপিটা। অন্ধকারে বোঝেনি কি আছে তাতে। খুলতেই আক্রোশে গর্জে উঠেছে মহানাগ। ছোবল বসিয়েছে তার হাতে

সর্বনাশ! ত্রিলোচন চঞ্চল হয়ে উঠল। অন্য কটা হানাদারের হাত ততক্ষণে শক্ত দড়িতে বাঁধা পড়েছে। ত্রিলোচন, অর্জুন ডাক্তার দৌড়ে গেলেন গলুইয়ের দিকে। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে লোকটা। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন।

সাপটা, সাপটা কোথায়? ত্রিলোচন প্রশ্ন করল তাকে।

দংশন করেই জলে লাফ দিয়ে পড়ল,কাতর কণ্ঠে লোকটি বলল, বাঁচাও ভাই আমাকে বাঁচাও!

একটু আগে যে লোকটা ত্রিলোচনদের প্রাণে মারার জন্য লাফিয়ে পড়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে ত্রিলোচন বলল, ভয় পাসনে। আমি ত্রিলোচন মাল বেঁচে থাকতে নাগদংশনে মরতে দেব না তোকে।

আর একবার বিস্ময়ের এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গেল অভির মন।

ত্রিলোচন মাল পাঁজাকোলা করে লোকটাকে তুলল নৌকার ছাদে। নতুন পাটের দড়ি দিয়ে মণিবন্ধে, বাহুর উপরে, পরপর দুটি বাঁধন দিল শক্ত করে। তারপর শুরু করল মন্ত্র-উচ্চারণ।

অর্জুন ডাক্তার নিজের হাতে হ্যাজাক লাইটটা ধরিয়ে দিলেন। বন্দী ডাকাত সর্দার ও তার দুই সঙ্গী অবাক হয়ে সব দেখছিল।

ডাক্তারবাবু, আপনাদের বাক্সে ইনজেকশান থাকলে হতভাগাটাকে ফুঁড়ে দিন একটা, বলল ত্রিলোচন।

কী বুঝছ ত্রিলোচন? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল ডাক্তার।

সদা ধরা সাপ। বিষদাঁত ভাঙা ছিল না। সবটুকু বিষই ঢেলে দিয়েছে। এখন মা মনসার ইচ্ছা আর এই অভাগাটার ভাগ্য। বলল ত্রিলোচন।

বাবু, আপনারা মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবতা। হুহু করে কেঁদে উঠল ডাকাতসর্দার নিকুঞ্জ গোলদার। বলল, ওকে বাঁচান বাবু। ঘরে ওর ছেলে আছে, বৌ আছে!

জল-পুলিশের গুলিতে মরতি, নয় সাপের কামড়েই মরলি, খেঁকিয়ে উঠল ত্রিলোচন।—নিরীহ লোকগুলোকে মারবার সময় তাদের ছেলে-বৌ'র কথা কেন ভাবিসনি? তোদের মরাই উচিত।

মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে লোকটার। শুয়ে আছে কাঠ হয়ে। শরীরের রঙটাও কেমন সবুজ সবুজ হয়ে উঠেছে। আর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে তার শরীরটা।

অর্জুন ডাক্তার ওর দিকে তাকাতেই অভি তাঁর ব্যাগটা এগিয়ে দিল।

একটা 'অ্যাম্পুল' বার করে ডাক্তার ত্রিলোচনের দিকে মুখ তুললেন। বললেন, কী করব ত্রিলোচন—ইনজেকশান দেব? ছোট ডাক্তার যেন সিভিল সার্জেনের হুকুম চাইছে!

মা বিষহরির নাম করে ফুঁড়ে দিন আজ্ঞে, বলল ত্রিলোচন।—আমার পুরানো বিদ্যে আর আপনার নতুন বিদ্যের যুগল মিলন হোক।

অর্জুন ডাক্তার ইনজেকশান দিলেন। বললেন, বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে।

ত্রিলোচন হাসল, মন বলছে বিপদ কেটে যাবে। মন্ত্র পড়তে পড়তে স্বয়ং মা বিষহরি বলে দেন ফিরিয়ে দিলাম তোর রোগীকে

কী অদ্ভুত বিশ্বাস। অভি অবাক হয়ে দেখছিল ত্রিলোচনের বিষ ছাড়াবার প্রক্রিয়া। রোগীর পায়ের দশ আঙুলে দশটা পাটের সুতো বেঁধেছে ত্রিলোচন। একটা পাত্রে কিছুটা নুন। এক একটা সুতো ধরে উপর থেকে নিচের দিকে টানছে। আর মন্ত্র পড়ছে বিষ নামানোর ওঝালি!

প্রায় ভোর রাত্রের দিকে লোকটা চোখ মেলে একবার তাকাল অস্ফুট গলায় বলল, একটু জল!

এখন জল নয়। বৃন্দাবনদা, জনতা স্টোভটা জেলে একটু দুধ গরম করে দাও বরং, বলল ত্রিলোচন।

কৌটোর দুধ গুলে গরম করে দিল বৃন্দাবন। লোকটা আস্তে আস্তে প্রায় আধগ্লাস দুধ খেল চুমুক দিয়ে। তারপর আবার চোখ বুজল

জয় মা বিষহরি, উঠে দাঁড়াল ত্রিলোচন। হতভাগার ভাগ্যে জেলের ভাত আছে, মরবে কেন?

ত্রিলোচনের এই 'জেলের ভাত' বলার কারণও ছিল। সে

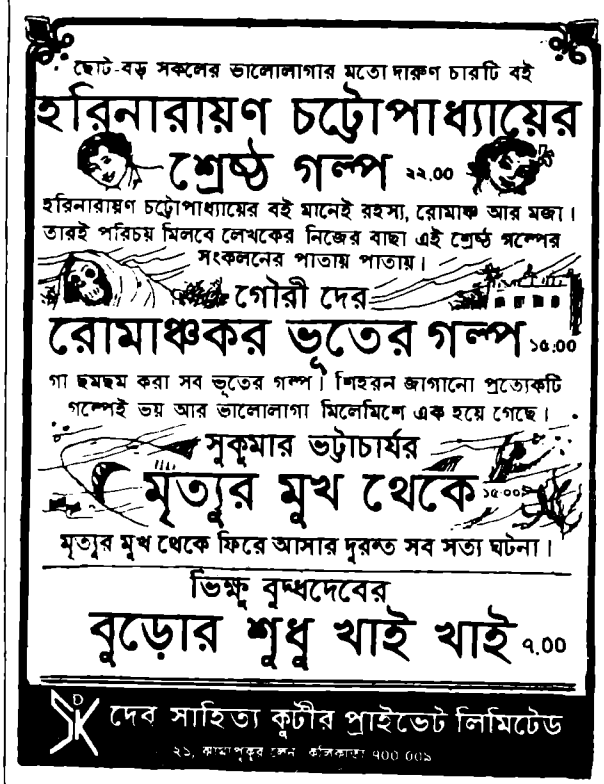

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল দূর থেকে সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের টহলদারি মোটরলঞ্চ তাদের নৌকার দিকেই এগিয়ে আসছে। ডাকাতের উপস্থিতির খবর হয়তো ওরা পেয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে জলপুলিশের লঞ্চটি এসে ভিড়ল তাদেরই নৌকার পাশে। তার আগেই ডাক্তারবাবুর ইশারা পেয়ে ত্রিলোচন বন্দীদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিল।

লঞ্চ থেকে জনৈক পুলিশ অফিসার অর্জুন ডাক্তারদের নৌকায় নামলেন। তারপরই প্রশ্ন, কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?

সুন্দরবন ঘুরে দেখছি. আমার নাম অর্জুন ব্যানার্জী, পেশা ডাক্তারি। নেশা ভ্রমণ। এরা আমার সহযাত্রী, বললেন ডাক্তারবাবু।

হ্যামিলটনের ডাক্তার ব্যানার্জী? পুলিশ অফিসারের কণ্ঠে সশ্রদ্ধ বিস্ময়, আপনার নাম অনেকবার শুনেছি। খুশি হলাম আপনার সংগে পরিচিত হয়ে

সন্দিগ্ধ পুলিশ অফিসারের নজরে পড়ল নিকুঞ্জ গোলদার আর তার সংগীরা। প্রশ্ন করলেন, এরাও কি....?

আজ্ঞে না, ওরা কাঠ কাটতে এসেছিল এদিকে। হঠাৎ ওদের একটা লোককে সাপে কাটে। আমাদের নৌকার মাঝি ওঝাগিরি জানে। ও-ই ওদের নৌকা থামিয়ে মরণের মুখ থেকে লোকটাকে ফিরিয়ে এনেছে, বললেন অর্জুন ডাক্তার।

তার মানে পুলিশের হাতে লোকগুলোকে তুলে দেবেন না অর্জুন ডাক্তার। একটা আশ্চর্য শ্রদ্ধায় ভরে উঠল অভিমন্যুর মন। কত বড় তার ডাক্তারকাকু!

বৃন্দাবন কোন ফাঁকে কয়েক কাপ চা করে ফেলেছে। টিন খুলে বিস্কুট বের করে প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে।

চা? পুলকিত পুলিশ অফিসার–করেছেন কি মশাই, এ রাজ্যে এমন ফ্লেভারঅলা চা পেলেন কোথায়?

বের হওয়ার আগে সব স্টক করে নিয়েছি, হাসলেন অর্জুন ডাক্তার। তারপর বললেন, শুধু চায়ের গুণ নয়, বৃন্দাবনের হাতেরও গুণ আছে। নইলে এমন স্বাদ পেতেন না!

সুন্দর হাত তোমার, থ্যাংক ইউ! বৃন্দাবনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন পুলিশ অফিসার। কিছুক্ষণ আলাপচারির পর পুলিশ অফিসার নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। জলপুলিশের লঞ্চ জল কেটে মিলিয়ে গেল দূরে।

হঠাৎ হো হো করে হাসিতে ভেঙে পড়ল বৃন্দাবন।

কি হলো বৃন্দাবনদা, এত হাসছ কেন?

হাসব না? বলল বৃন্দাবন, কানা দারোগাটা আমায় চিনতেই পারেনি। জানেন ডাক্তারবাবু, ঐ গোকুল দারগার হাতেই দু' দু'বার ধরা পড়েছি আমি। ব্যাটা বলে কিনা সুন্দর হাত তোমার, থ্যাংক ইউ। আবার হাসিতে ফেটে পড়ল বৃন্দাবন।

বাবু, পায়ে হাত দিয়ে বলল নিকুঞ্জ গোলদার, আমাদের মার্জনা করুন।

ওঠো, পা ছাড়ো, বললেন অর্জুন ব্যানার্জী।–মার্জনা করার আমি কে? তবে এরপর থেকে আর এসব বাজে কাজে নেম না। শরীরে শক্তি আছে, খেটে খাও। দেখলে তো পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হয়।

এই নাক কান মলছি বাবু, আর এসব করব না। অনুতপ্ত নিকুঞ্জের চোখ ছলছল করে উঠল।

তোমরা বরং নৌকা নিয়ে আমাদের সংগেই চল। লোকটা এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ওর উপর একটু নজর রাখা দরকার, বললেন ডাক্তারবাবু।

ওকে তা হলে আমাদের নৌকায় নিয়ে যাই, অনুমতি চাইল নিকুঞ্জ গোলদার।

না, ও আমাদের বোটেই থাকুক আজকের দিনটা, বলল ত্রিলোচন, দরকার হলে আমি আর গুণধর নৌকায় গিয়ে শোবো। কাল ভগৎপুর পৌঁছে তারপর তোমাদের ব্যবস্থা, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

তুমি এ জলযাত্রার ক্যাপটেন, আর বৃন্দাবন হচ্ছে গাইড। আমরা তো শুধু প্যাসেঞ্জার। তোমার কথার উপর কথা বলব আমার এত সাহস? হাসি মুখে বললেন ডাক্তারবাবু।

ছিঃ বাবু, অমন কথা বলবেন না, অর্জুন ডাক্তারের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল ত্রিলোচন। বলল, আপনার মতো প্যাসেঞ্জার পাওয়া আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য ডাক্তারবাবু।

আর আমি? বলল অভি, আমরা বুঝি ফ্যালনা? ভেসে এসেছি? বাঃ তিলুদা বাঃ!

তোমার কথা কী আর বলব দাদাবাবু, ত্রিলোচন বলল, হতভাগা তোমার গলায় ভোজালিটা ঠেকাল, খুন করার ভয় দেখাল, তুমি কিন্তু বীরের মতো দাঁড়িয়ে রইলে, একটুও কাঁপলে না। সার্থক অভিমন্যু নাম তোমার। ইস্, তোমার মতো একটা ভাই থাকত আমার!

কেন আমি তো তোমার ভাই-ই। তিলুদা বলে ডেকেছি না তোমায়? বলল অভি।

একটা ঠ্যাঙ্ কামোটে কেটে নিয়েছে বলে এই হতভাগা বৃন্দাবনের কথাটা কারোর মনেই পড়ছে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলল বৃন্দাবন গায়েন বেশ শব্দ করে।

এই হিংসা করবে না বৃন্দাবন, চেঁচিয়ে উঠল ত্রিলোচন।

না, হিংসা করব কেন? তিলুদা তোমরা না হয় আপন ভাইই হলে, ডাক্তারবাবুর এই ছাওয়ালটার আমি সৎভাই হওয়ারও কি যোগ্য নই, বলল বৃন্দাবন। তারপর নিজেই আবার হেসে উঠল। বলল, সংসারের সৎ ভাইও অনেক সময় আবার আপন ভাইয়ের চেয়েও বড় হয়ে যায় মনে রেখো তিলুদা।

আশ্চর্য এক প্রীতি ও মমতার নাটক যেন চলছিল। নদী এখানে অপার বিস্তারে মহিমময়। আকাশ আ-দিগন্ত প্রসারিত। এই বিরাট বিশাল উন্মুক্ততার মধ্যে কোন জাদুমন্ত্রে মনটাও যেন উদার হয়ে যায়। কত অনায়াসে পরকে আপন করে নিতে পারে। অনাত্মীয় আত্মীয় হয়ে ওঠে।

দুই কিশোর হাতে ত্রিলোচন আর বৃন্দাবনের হাত ধরে অভি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, কারো হিংসা করার কিছু নেই। তোমাদের দুজনেরই আমি ছোট ভাই।

(চলবে)

ছবি: বিজন কর্মকার

দুঃখীরাম শান্তিরাম

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

দুঃখীরামের আর দুঃখ নেই। লটারিতে টাকা পেয়েছে বলে নয়। টাকা অনেকেরই থাকে, কিন্তু যা থাকে না তা হলো সুখ, তা হলো শান্তি। দুঃখীরাম এখন সুখী। তার পোষা ভূত শান্তিরাম এখন মনের মতো ভূত। একটা হাত লম্বা, একটা পা লম্বা। তা হোক, তবু দুঃখীরামের মন ঠান্ডা। সে যা চেয়েছিল তার সবটা না হলেও অর্ধেকটা তো পূরণ হয়েছে। মানুষ যা চায় সব সময় তা পায় না। যতটা পায় তাই নিয়ে সুখী হতে হয়। শান্তিরাম যখন ছাদে বসে বসেই লম্বা হাতটা বাড়িয়ে গাছ থেকে আমটা, জামটা, কলাটা এনে দেয়, তখন দুঃখীরামের এক হাত বুকটা ফুলে দশ হাত হয়ে যায়।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। শরতের মেঘ, বাতাসের বেগ, নদীর জল, গাছের ফল—এই আছে, এই নেই বললেই হয়।

দুঃখীরামের বিয়ে হলো। ছেলে হলো। দেখতে দেখতে ছেলে চার বছরে পা দিল। আর ঠিক তারপরেই ঘটল ঘটনাটা

"খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করল এঁড়ে গরু কিনে।" ভূত আর পুত নিয়ে দিনগুলো কাটছিল ভালই। হঠাৎ কি হলো, একটা বাড়ি কিনল, তারপর একটা ছেকড়া গাড়ি কিনল প্রথমে কিনতে চায়নি, কিন্তু যেই শুনল বাড়িটা ভূতের বাড়ি, গাড়িটা ভূতের গাড়ি, দুঃখীরাম আর ঠিক থাকতে পারল না। দুটোই কিনে বসল।

বাবা বলল, 'এত বাড়ি থাকতে ঐ ভূতের বাড়ি!'

মা বলল 'এত গাড়ি থাকতে ভূতের গাড়ি!'

তা কে শোনে কার কথা। টাকা পেলে কাড়াকাড়ি। ভূত পেলে বাড়াবাড়ি।

নতুন বাড়ি, পোড়ো বাড়ি। গাঁ থেকে দূরে, বনের ধারে। বাড়ির পাশে পুকুর। এক পুকুর মাছ। এক পুকুর জল। পাড়ে এক পাড় গাছ। গাছে এক গাছ ফল। শুধু ঈশান কোণে আকাশ পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তেঁতুলগাছটা তাতে না ধরে ফুল, না ধরে ফল। কেন ধরে না তা তো কেউ জানে না। আসলে গাছটাতে থাকে একটা ভূত। ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষের গান হবে না, তবু সে ছাড়বে না! শেষে এমন গলা সাধতে লাগল যে গলার শির ছিঁড়ে পাঁচু ঘোষ গেল ভবপারে। টেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষের স্থান হলো যমরাজের ধরমশালার পাশে, খোলা বারান্দার কোণে। ধরমশালায় জায়গা নেই। হাউস ফুল। সকালে পাঁচু ঘোষ গেল। সন্ধ্যে হলো। কতক্ষণ আর বাইরে পড়ে থাকা যায়। পাঁচু ঘোষ গলা সাধতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে ধরমশালা খালি। সবাই ছুটল যমরাজের কাছে। যমরাজ ঘুমোচ্ছিল। জোরে জোরে নাক ডাকছিল। হঠাৎ নাক থামল। যমরাজের ঘুম ভঙল। যমরাজ লাফিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপার?'

সবাই সমস্বরে বলে, 'গান। গানের জন্যে ধরমশালায় থাকতে পারছি না।'

'গান! কে গায়? এদিকে আয়।'

সবাই ধরাধরি করে ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষকে নিয়ে এল।

'বাড়ি কোথা?' শুধোয় যমরাজ

'হুজুর, আগে ছিল তেঁতুলতলা, এখন আপনার ধরমশালা।'

'গান গাওয়া হচ্ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

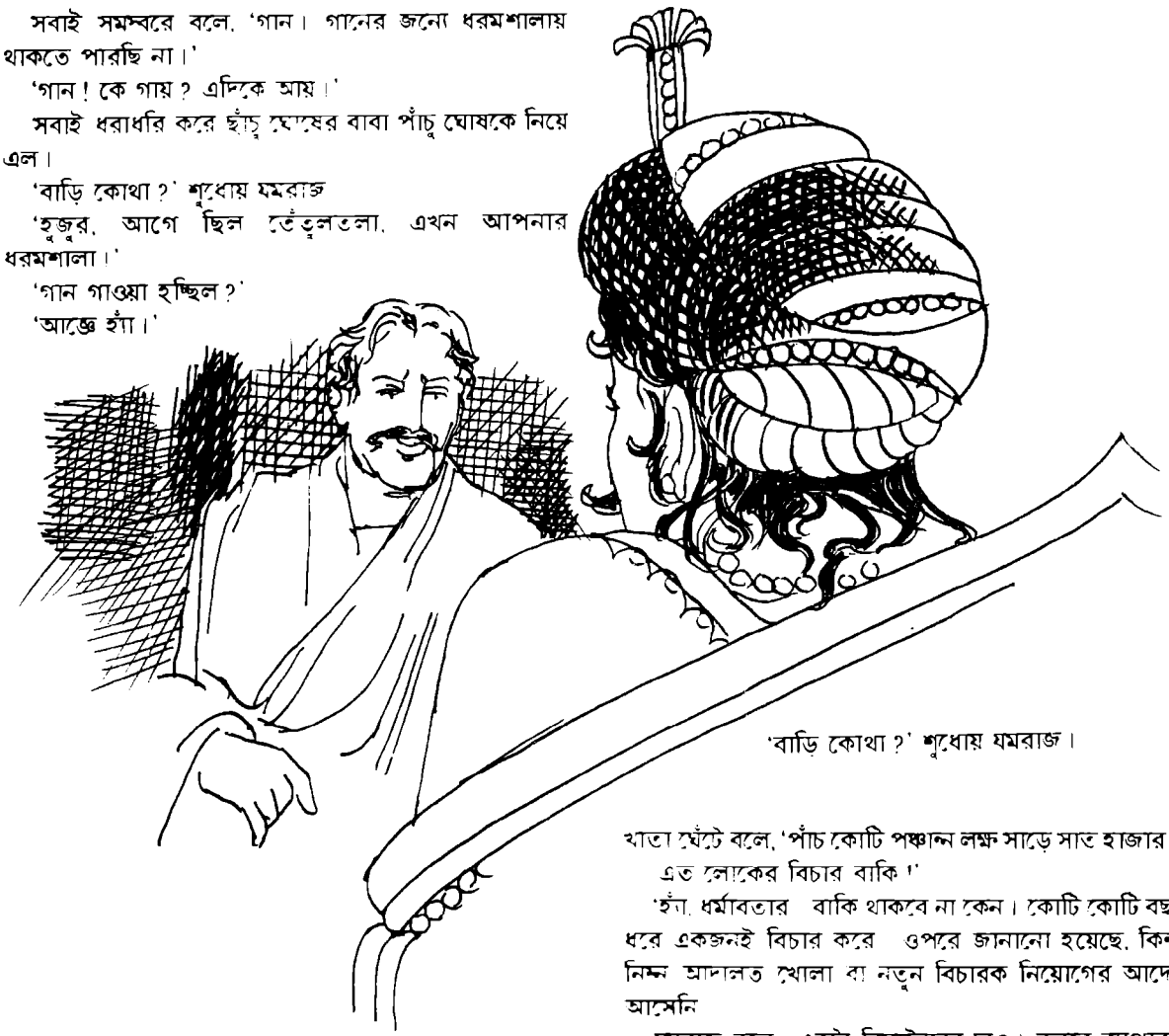

'বাড়ি কোথা?' শুধোয় যমরাজ।

'জান না ধরমশালা কর্মশালা নয়। ওখানে রাঁধতে পারবে না, খেতে পারবে না, শুতে পারবে না, ঘুমোতে পারবে না, গাইতে পারবে না, নাচতে পারবে না, তালা দিতে পারবে না, তালা খুলতে পারবে না। চিত্রগুপ্ত–'

'ধর্মাবতার–'

'আইন-কানুনগুলো বল না।'

'মাছ খাবে না, মাংস খাবে না, ডিম খাবে না, আলু খাবে না, পটল খাবে না, ভাত খাবে না, রুটি খাবে না–'

'তুমি আইন ভেঙেছ।'

পাঁচু ঘোষ বলল, 'কি করব ধর্মাবতার। এসে দেখি ধরমশালায় থাকার জায়গা নেই।'

চমকে ওঠে যমরাজ, 'সেকি! চিত্রগুপ্ত– কত লোকের বিচার বাকি?'

চিত্রগুপ্ত নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে, গোটা দশেক জাবদা খাতা ঘেঁটে বলে, 'পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সাড়ে সাত হাজার।'

এত লোকের বিচার বাকি!'

'হ্যাঁ, ধর্মাবতার বাকি থাকবে না কেন। কোটি কোটি বছর ধরে একজনই বিচার করে ওপরে জানানো হয়েছে, কিন্তু নিম্ন আদালত খোলা বা নতুন বিচারক নিয়োগের আদেশ আসেনি

যমরাজ বলে একটা রিমাইন্ডার দাও। বলবে ব্যাপারটা জরুরী

'যে আজ্ঞে

ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষ বলে, 'ধরমশালায় জায়গা না পেয়ে বাইরে বসলাম। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই মশার উপদ্রব।'

যমরাজ হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, এখানেও মশা হচ্ছে আজকাল। তা মশাকে তোমরা অত ভয় পাও কেন?'

'ধর্মাবতার, মর্ত্যবাসী বাঘকে যতটা না ভয় খায় মশাকে তার চেয়ে বেশি ভয় খায়। কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক, ইঁদুর থেকে প্লেগ, কিন্তু মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া। এখন আবার এনকেফেলাইটিস্। মশাকে না পারা যায় একবারে মারতে, না তাড়াতে, না আটকাতে। মশার ভয়ে গলা সাধতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরমশালা খালি।'

'কি সর্বনাশ! চিত্রগুপ্ত–'

'দেখছি ধর্মাবতার।'

চিত্রগুপ্ত চলে গেল। যমরাজ বলল, 'তোমাকে এখানে রাখা বিপজ্জনক। তুমি মশার চেয়েও ভয়ানক। তোমার কোথায় যেন বাড়ি বললে?'

'তেঁতুলতলা, ধর্মাবতার।'

'যাও, তেঁতুলতলার তেঁতুলগাছে চার লক্ষ বছর ধরে ভূত হয়ে থাকগে।'

'সেকি ধর্মাবতার! আমি একা!'

'কেন একা কেন?'

'আজকাল মর্তে ভূতের দেখা মেলে না। নিজের কানেই শুনলেন কত কোটি লোকের বিচার বাকি। যে কটা ভূত আছে ভূতো মিঞারা সব কটাকে স্টোর-রুমে স্টক করে রেখে দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছে। ভূত দেখা যায় না, তাই লোকে ভূত বিশ্বাস করে না।'

'এত কান্ড! ঠিক আছে যাও। শীগগির বিচার সেরে ভূত পাঠাতে শুরু করছি।'

তা সেই যে ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষ এসে তেঁতুলগাছে বাসা বাঁধল আর নড়তে চায় না। আর ভূতেরা যে গাছে থাকে সে গাছে না হয় ফুল, না হয় ফল।

এখন শান্তিরাম এসে যেই না ছাঁচু ঘোষের বাবা পাঁচু ঘোষের দেখা পেল, মনের সুখে গান ধরল। এতদিন তার একটা মনের মতো দোসর জুটল।

দুঃখীরামের ছেকড়া গাড়ি, ভূতের গাড়ি। এই ভাল, এই খারাপ। মাথা ভাল থাকলে আপনিই চলে। না লাগে ড্রাইভার, না স্টীয়ার। বিগড়ে গেলে হাজার লাথি খেলেও নড়বে না। টুঁ শব্দটি করবে না।

দুঃখীরাম যাবে বেড়াতে। দিল্লী, বোম্বে নয়। কলকাতা। সঙ্গে যাবে ওর ছেলে। চিড়িয়াখানা দেখাবে, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হল দেখাবে। গাঁ থেকে স্টেশন পর্যন্ত যাবে ওর গাড়িতে। সময় লাগবে কম করে এক ঘন্টা। নটায় ট্রেন। দুঃখীরাম বেরোল আটটায়। গাড়িটা বেশ কিছুটা গেল। তারপর রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। নড়ে না। সরে না। টুঁ শব্দটি করে না। কি করা যায়? দুঃখীরাম প্রথমে হাত লাগাল। তারপর পা। শেষে হাত-পা দুইই। গাড়ি নট নড়ন-চড়ন।

ঠিক এই সময় পল্টুবাবুর গাড়ি এসে হাজির। স্মাগলিং গুড্‌সের কারবার করে পল্টুবাবু। ইয়া বড় বাড়ি। ঝকঝকে গাড়ি। বাড়িতে বড় বড় লোকের যাতায়াত।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দুঃখীরামের ছেকড়া গাড়ি। দেখে পল্টুবাবু হেসে গড়াগড়ি।

'কে রে? কার গাড়ি?' শুধোয় পল্টুবাবু।

'আমার নাম দুঃখীরাম।'

'দুখো! তুই কিনেছিস গাড়ি! মনে হচ্ছে বিলেত থেকে এসেছে?'

হাসে পল্টুবাবু আর তার দলবল। হাসি থামে না। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

পল্টুবাবু শুধোয়, 'কি হলো, চলছে না?'

নিউবেঙ্গলের নতুন বই

অদ্ভুত গোয়েন্দা

রাধারমণ রায়

দাম: ১৮ টাকা মাত্র

গোয়েন্দা গণেশ হালদারের গোয়েন্দাগিরি সত্যিই অদ্ভুত রকমের। সাহস, বুদ্ধি আর তৎপরতা—এই তিনটি গণেশ হালদারের সাফল্যের চাবিকাঠি। আর গণেশ হালদার মানুষটিও ভারী অদ্ভুত। সেই অদ্ভুত গোয়েন্দার কীর্তিকলাপের কথা পড়তে পড়তে তোমরা রোমাঞ্চিত হবে, সংখ্যার রহস্য ভেদ করার আনন্দে বিভোর হবে। সেই সঙ্গে গুপ্তধন খুঁজে বের করার উন্মাদনা, সেই গুপ্তধনের সন্ধানে আসা একদল ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়াই-এর উত্তেজনা তোমাদের টানটান করে তুলবে।

বিপন্ন প্রকৃতি

ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী

দাম: ২৮ টাকা মাত্র

বিপন্ন বন্যপ্রাণী প্রজাতি নিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সম্মতরূপে কোনও বই আজ অবধি লেখা হয়নি। বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতি ও বৃক্ষ প্রজাতি প্রকৃতির বুক থেকে নিঃশেষ হওয়ার কারণ কী তাও জানা যাবে এই বইটি থেকে। এ সব বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির ভারসাম্য মানুষের কী কাজে লাগে—'বিপন্ন প্রকৃতি' সে সম্পর্কে সুন্দর ভাবে আলোকিত করেছে প্রকৃতি বিজ্ঞানী লেখকের কলমে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে এই সব প্রাণীদের সংরক্ষণ যে প্রয়োজন সে কথা বইটির পাতায় পাতায় সুচারুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীর কলমে।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ;
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

দুঃখীরাম বলে, 'না।'

'য়াবি কোথা?'

'স্টেশনে। নটার গাড়ি ধরে কলকাতা যাব।'

আবার হাসে পল্টুবাবু। হাসতে হাসতে বলে, 'ওরে তোরা শুনছিস–দুখোবাবু কলকাতা যাবে তা কলকাতায় কেন শুনি? মন্ত্রী-টন্ত্রীর সঙ্গে কোনো জরুরী মীটিং আছে বুঝি?'

হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই দুঃখীরাম চুপ করে থাকে।

পল্টুবাবু বলে, 'ওরে নেমে আয় সবাই। বিলেতের গাড়ি লাথি না খেলে নড়বে না

এর পর সবাই মিলে লাথি মারতে মারতে দুঃখীরামের গাড়িকে একবারে নদীর ধারে নিয়ে আসে।

দুঃখীরাম বলে, 'দোহাই আপনার, গাড়িটাকে আর ঠেলবেন না। নদীতে পড়ে যাবে

'তা ঠিক, তা ঠিক ওরে আর ঠেলিস না। অমন নতুন গাড়ি। খাদে পড়ে ভেঙে যাবে দুখোবাবু কলকাতা যাবে কি করে?'

গাড়িতে ওঠে সবাই পল্টুবাবু হেসে বলে, 'তাহলে দুখোবাবু, স্টেশনে দেখা হবে তোমার জন্যে টিকিট কেটে রাখব। টা-টা বাই-বাই

দুঃখীরামের কি হলো, হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনাকে আর কষ্ট করে কাটতে হবে না আপনি ভদ্রলোক। গণমান্য আমি নগণ্য। আমিই বরং আপনার টিকিট কেটে রাখব।'

পল্টুবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর চিৎকার করে ওঠে, 'তা যদি পারিস তোকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দোব। আর যদি না পারিস তোর ঐ ছেকড়া গাড়িটাকে টেনে সাগরে ফেলে দিয়ে আসব গাড়ি চলে গেল।

মহাচিন্তায় পড়ল দুঃখীরাম বেড়াতে যাচ্ছে। তাই শান্তিরামকে আনেনি। এখন কি হবে? এখন গাড়ি-মিস্ত্রী এসেও কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। মিস্ত্রী ডাকতে যে যাবে তারও উপায় নেই। ছেলেটা গাড়িতে আছে। দুঃখীরাম লোক ডাকার জন্যে যেই না দু পা গেছে হঠাৎ দেখে পল্টুবাবুর গাড়িটা ফিরে আসছে। ব্রিজের ওপর থামল গাড়িটা।

গাড়ি থেকে একজন নামল। পল্টুবাবু বলল, 'বাচ্চু, যা বললাম মনে থাকে যেন।'

ধুলো উড়িয়ে চলে গেল গাড়িটা। বাচ্চু এগিয়ে এল। দুঃখীরামের ছেলেটাকে গাড়ি থেকে তুলল। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল উল্টো রাস্তা ধরে। দুঃখীরাম ছুটে যায়। ছোটে বাচ্চু। চিৎকার করছে দুঃখীরামের ছেলেটা। দুঃখীরাম আর বাচ্চুর মাঝখানের ব্যবধানটা কমে আসতে থাকে। হঠাৎ বাচ্চু করল কি, একটা অশথগাছের কুরি ধরে উঠে পড়ল গাছে। তারপর মগডালে। অসহায় দুঃখীরাম অনেক অনুনয়-বিনয় করল। কিন্তু ফল হলো না। বাচ্চু ওপর থেকে চিৎকার করতে লাগল, 'দশ হাজার টাকা! যা গাড়ি চালা।'

দুঃখীরাম বলে, 'আমার ছেলেকে দাও। আমি টাকা চাই না।'

'সেকি! দশ হাজার টাকা! নিবি না?'

'সত্যি বলছি, আমি টাকা চাই না।'

'আর কুড়ি মিনিট আছে। তোর ক্ষমতা কি ঐ ছেকড়া গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যাস।'

দুঃখীরামের ছেলেটা চিৎকার করে, 'বাপি, আমি তোমার কাছে যাব।'

দুঃখীরাম বলে, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ওর কোনো ক্ষতি কর না। আমার একটা মাত্র ছেলে।'

বাচ্চু বলে, 'ছেলেকে নিবি?'

'হ্যাঁ, ওকে ফিরিয়ে দাও।'

'এই নে।'

বাচ্চু মগডাল থেকে ফেলে দিল দুঃখীরামের ছেলেকে। দুঃখীরাম দুচোখ বুজে বসে পড়ল। মিনিটখানেক পরে দুঃখীরাম তাকাল। কিন্তু কোথায় খোকা!

চিৎকার করে দুঃখীরাম, 'খোকা–

'এই যে স্যার, গাড়িতে।'

অবাক চোখে তাকায় দুঃখীরাম। দেখে খোকা বসে আছে গাড়িতে। আনন্দে আত্মহারা দুঃখীরাম বলে, 'শান্তিরাম–'

'ইয়েস স্যার।'

'তুমি–তুমি না এসে পড়লে আমার খোকা এতক্ষণ–'

শান্তিরাম বলে, 'তেঁতুলগাছের ডালে বসেছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল অশথগাছের ওপর। তারপর চলে এলাম।'

'এতদিন পোষা ভূত ছিলে, আজ থেকে বন্ধু হলে।'

'স্যার, তাড়াতাড়ি গাড়িতে চেপে পড়ুন। তা নইলে ট্রেন পাবেন না।'

'ঠিক বলেছ। পল্টুবাবু আমাকে অপমান করেছে। আমার গাড়িকে অপমান করেছে। কিন্তু স্টেশনে কি ওদের আগে পৌঁছুতে পারব?'

শান্তিরাম বলল, 'এদিকে আসুন। গাড়িতে বসুন।'

দুঃখীরাম এল গাড়িতে বসল। আর অবাক কান্ড! ছেকড়া গাড়ি ছুটতে শুরু করল। বাচ্চু গাছ থেকে নেমে গাড়িটাকে ধরতে গেল কিন্তু পারল না।

ছুটছে দুঃখীরামের ছেকড়া গাড়ি। ঠিক যেন হাওয়া। দুঃখীরাম বলে, 'শান্তিরাম। নটার আগে যদি পৌঁছুতে না পারি তাহলে কিসের গাড়ি, কিসের বাড়ি!'

শান্তিরাম বলে, 'সরি। ভেরি সরি। দেখি পারি কি না পারি।'

দুঃখীরাম স্টেশনে হাজির। কিন্তু কোথায় পল্টুবাবু? দুঃখীরাম টিকিট কাটল। তারপর ফিরে এল। দেখল পল্টুবাবু আসছে হনহন করে।

দুঃখীরাম পল্টুবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর সবিনয়ে নিবেদন করল, 'আপনার টিকিট।'

ছবি: ধ্রুব রায়

নতুন রোজানা

স্রেফ্ মুঠি-ভর রোজানা বাড়ায়
রান্নার সজীব আকার আর
রাখেও স্বাদ চমৎকার !
সাশ্রয়কর আর স্বাস্থ্যকর প্যাকে
ভরা নতুন রোজানা ।

কমপ্লান, ফ্যারেক্স, গ্লুকন-সি,
গ্লুকন-ডি' নির্মাতাদের আরেক
অবদান ।

ROZANA

ভরপুর প্রোটিনযুক্ত সয়া বড়ি আর দানা

১০০% নিরামিষাশী

বর্তমানে নির্বাচিত বাজারগুলিতেই পাবেন ।

Gx.568.92.Bn

অদ্ভুত একটা মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিলি ভয় পেয়ে গেলো

বিলির বুট

(৫৫)

বিলি ডেন খুঁজে পেয়েছিলো প্রাক্তন খেলোয়াড় ডেড সট কিনের একটা ছেঁড়া বুট। বুটটা পরে খেললেই বিলির খেলা একদম ডেড সটের মতো হয়ে যায়। একদিন একদল দুষ্টু ছেলে বিলিকে মেরে তার বুট-টুট সব জালের ওপারে ঘেরা জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সেগুলো উদ্ধার করতে গিয়েই বিলি পড়লো ঝামেলায়। দেখলো অদ্ভুত একটা মূর্তি ওর দিকে এগিয়ে আসছে

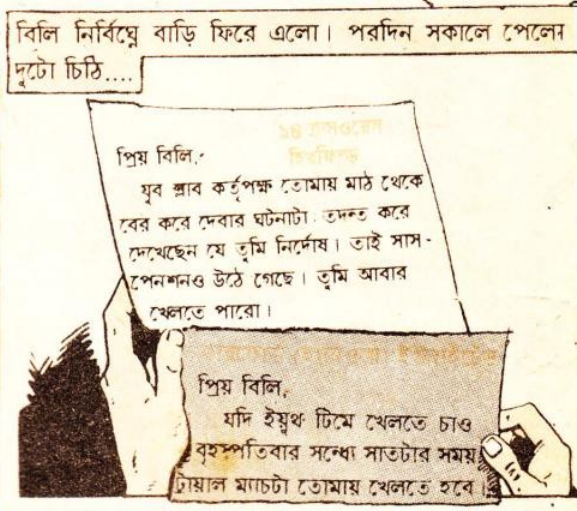

ডেড সটের বুটটা পায় না থাকায়, বিলি প্র্যাকটিশেও সুবিধে করতে পারলো না।
এই বিলি, এ কী করছিস! হেড দেবার মতো করে বল তুলে দিবি তো!
এই ট্রেনিং শু পরে অসুবিধে হচ্ছে!
অনুশীলনের পরে....
শোন, শনিবারের খেলার জন্যে তোমরা তোমাদের বুট-টুটগুলো এই বাক্সর মধ্যে রাখো! ড্রাইভার আজ রাত্তিরেই এটা নিয়ে চলে যাবে। তোমরা সকাল নটার সময় অবশ্যই চলে আসবে!
বাঃ, বেশ মজা তো! শনিবারে আমরা এন্ডারটনে গিয়ে খেলবো।
বিলি ওর বন্ধু জিম পার্কসের সঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলো....
গ্রামের দলের হয়ে খেলে এলি। কেমন লাগলো রে?
ভালোই। সেদিন ইউনাইটেড থেকে একজন পর্যবেক্ষক এসেছিলেন। তিনি আমাকে ওদের যুব দলে খেলতে বলেছেন....
খেলা কাল রাত্তিরে....সর্বনাশ! আমার বুটটা দিয়ে এলাম....ওটা আমায় ফিরে পেতেই হবে...
দেরি হয়ে গেছে রে বিলি। আমরা ক্লাব থেকে বেরুবার আগেই মিঃ লেটন ওটা গাড়িতে তুলে দিয়েছে। ওটা এখন মাঝপথে!
দুশ্চিন্তায় সারারাত বিলির চোখে ঘুমই এলো না....
আমায় কাল খেলতেই হবে। কিন্তু ডেড সটের বুটটা ছাড়া আমি তো খেলতেই পারবো না....
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইউনাইটেড ক্লাবের বিশাল স্টেডিয়ামে বিলি হাজির হলো....
বুট আনোনি তো কি হয়েছে সাজঘরে গিয়ে বলো, মাপ মতো বুট দিয়ে দেবে....
ধন্যবাদ মিঃ মার্টিন, আমি তাহলে ড্রেস করতে যাই?
অন্য বুট পরে বিলি সেই নির্বাচনী ম্যাচটা খেলতে নামলো....
ঐ ছেলেটাকে লক্ষ্য করুন মধ্যে ওই সেরা। ওয়াটার বেরিতে সেদিন যা খেলেছিলো না
মিঃ কুশিয়ন....এদের
জেরি তোমার মুখে এমন প্রশংসা! আশা করি ছেলেটা তোমার প্রশংসার মর্যাদা রাখতে পারবে!
কিন্তু অন্য বুট পরে বিলি জঘন্য খেলছিলো!
এ কী। মারতেই পারলাম না!
আবার ফস্কালাম!
এ কী! আমি তো সোজা মারতে চেয়েছিলাম!
ওকে তুলে নাও জেরি! ও তো খেলতেই পারে না।
আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সেদিন ও অতো সুন্দর খেললো আর আজ এমন জঘন্য খেলা। ঠিক আছে ও তো শনিবারে ইয়ুথ ক্লাবের হয়ে খেলবে। সেদিন আবার দেখবো।
বিলি কি সেদিন ভালো খেলতে পারবে? জানতে পারবে শুকতারার কার্তিক সংখ্যায়।

বাঘের নেশা

গোরাচাঁদ পাল

টিপু সুলতানের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর মতো সাহসী ও দূরচেতা রাজা খুব কম ছিলেন। একসময় মহীশূরের এই সুলতান ইংরেজদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঘের মতো বলশালী টিপু সুলতান বলতেন, দুশো বছর ভেড়ার মতো বেঁচে থাকার চেয়ে বাঘের মতো দুদিন বাঁচাও ভাল। এত বড় কথা যিনি বলতে পারতেন তিনি যে কত শক্ত মানুষ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কারো কারো পাখি পোষার শখ থাকে। কেউ পোষেন কুকুর বেড়াল। রাজাদের আবার শখ থাকে হাতি-ঘোড়া পোষার। বাঘের মতন পরাক্রমশালী টিপু সুলতান তেমনি তাঁর বাগানে শখ করে বাঘ পুষেছিলেন।

শুধু কি তাই? তাঁর সমস্ত পরিধেয় ছিল হলুদ-কালো রং মেশানো। বাঘের ছালের মতো ডোরাকাটা রুমাল তিনি সবসময় ব্যবহার করতেন। তাঁর সৈন্যদের পোশাকও হলুদ-কালো ডোরাকাটা রঙের ছিল। অস্ত্রশস্ত্রে বাঘের ছবি খোদাই করা থাকত।

সুলতানের বাঘ পোষার শখ নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। গল্পগুলোর যদিও কোনো ঐতিহাসিক সত্য নেই তবু একসময় এসব কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরত।

একদিন এক শিকারী সুলতানের কাছে এল, বলল, আমার কাছে এক অদ্ভুত ও অসাধারণ বাঘের বাচ্চা আছে, আপনি নেবেন?

সুলতান তক্ষুণি রাজী।

শিকারী সুলতানকে বাঘের বাচ্চাটি দিয়ে বলল, শিকার করতে গিয়ে গভীর জঙ্গলে এক ঋষির কাছ থেকে এটা পেয়েছিলাম তখন খুশি হয়েছিলাম কিন্তু যত দিন যাচ্ছে আমি ততই আতঙ্কিত হচ্ছি একে আর আমার কাছে রাখা সমীচীন মনে করছি না আপনি একে নিন।

—এতদিন রেখে এখন আমাকে দিতে চাইছ কেন শিকারী?

—কারণ সুলতান এর যখন দশ বছর বয়স হবে তখন প্রতি অমাবস্যায় একে খাদ্য হিসেবে একটি মানুষ দিতে হবে। এই কথা আমাকে ঐ ঋষি বলেছিলেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সুলতান। তাই বলছি আপনার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভবপর নয়।

সুলতান একটু চিন্তা করে গম্ভীর গলায় বললেন, রাজা হিসেবে আমার পক্ষে একটি করে জ্যান্ত মানুষ যোগাড় করা হয়তো সম্ভব কিন্তু এমন অন্যায় কাজ তো আমি করতে পারি না।

সুলতানের মুখে এ কথা শুনে শিকারী বলল, আপনার কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী থাকতে পারে। সেই দণ্ডিত মৃত্যুপথযাত্রীদের এক একজনকে বাঘের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রস্তাব শুনে সুলতান প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখব। বাঘের

বাচ্চাটা আমার কাছে দিয়ে তুমি যেতে পার।

সেই থেকে বাঘের বাচ্চা সুলতানের কাছে রয়ে গেল। ক্রমে দশ বছর পূর্ণ হলো। এবার ঋষির কথামতো অমাবস্যার দিন বাঘকে খাদ্য হিসেবে একটি করে মানুষ দিতে হবে। টিপু সুলতানের এ এক কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষা তিনি এড়িয়ে যেতে চান না। তাঁকে জিততেই হবে। কিন্তু কিভাবে? প্রশ্নটা টিপুর মনকে তোলপাড় করতে লাগল। তিনি ভাবলেন, বাঘকে নরমাংস কেনই বা খাওয়ানো হবে? কোনো উপায়ে কি ঐ নিষ্ঠুর কাজ ঠেকানো যায় না?

কিছুদিন পর সেই শিকারী আবার এল, বলল, সুলতান, আমি এসেছি।

–তোমার বাঘের বাচ্চাটা বড় হয়েছে, দশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

–আপনার কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী আছে তো?

সুলতান বললেন, সেরকম কোনো আসামী আমার কারাগারে নেই। আর থাকলেও আইনত তাদের বাঘের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

শিকারী সন্ত্রস্ত হলো, বলল, প্রতি অমাবস্যায় ঐ বাঘটিকে নরমাংস না খাওয়াতে পারলে ভয়ংকর অঘটন ঘটবে। আপনার সুলতান বংশ ধ্বংস হবে।

–সে কী? প্রচণ্ড মনোবলে বলীয়ান সুলতান কখনো এমন দুর্বলতা অনুভব করেননি। কিন্তু শত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁর মন কিছুতেই এই অন্যায় প্রস্তাব মেনে নিতে পারে না। তাতে যা হবার তাঁর হোক।

এদিকে বাঘের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে মহীশূর শহরে। সকলেই উৎকণ্ঠিত। চারদিকে একটা কি হয় কি হয় ভাব। অমাবস্যার তো আর মাত্র তিন দিন বাকি! সুলতানের চোখেও ঘুম নেই।

যখন আর মাত্র একদিন বাকি, একটি ছোট্ট মেয়ে হাজির হলো সুলতানের দরবারে। সুলতানকে সে কুর্নিশ করে বলল, যদি আপনি হুকুম করেন তো অমাবস্যার দিন আমি বাঘের কাছে যেতে রাজী আছি।

সুলতান প্রথমটায় হতবাক হয়ে গেলেন মেয়েটির কথা শুনে। কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। রাগতস্বরে মেয়েটিকে বললেন, আমি তোমার সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। তুমি কি করে ভাবলে এমন অন্যায় আদেশ আমি দিতে পারি?

মেয়েটি বলল, রাগ করবেন না সুলতান। আমি বলছি বাঘটা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরঞ্চ আমি থাকলে তার উপকারই হবে।

ইচ্ছা না থাকলেও মেয়েটির কাকুতি-মিনতিতে সুলতান প্রতিহারীকে ডেকে বললেন, একে আজ তোমার কাছে রাখ। কাল দেখা যাবে ও কি করে।

পরদিন অমাবস্যার রাতে সুলতানের আদেশে মেয়েটিকে বাঘের খাঁচার সামনে আনা হলো। সুলতান নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে। চারপাশে তাঁর লোকলশকর। কোনোদিকে না তাকিয়ে মেয়েটি একটি করুণ গান গাইতে শুরু করল। ক্রমশ সেই গানের সুর-মূর্ছনা সেখানকার আবহাওয়ায় এক মুগ্ধ আবেশ ছড়িয়ে দিল। খাঁচার বাঘটাকে মনে হলো যেন কান পেতে সেই গান শুনছে। একসময় এসে খাঁচার গরাদে নাক ঠেকিয়ে মেয়েটির ঘ্রাণ নিল। তারপর সরে গিয়ে খাঁচার একধারে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে সুলতান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এমন সুন্দর গান তিনি কোনোদিন শোনেননি। গানের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য যেমন বাঘের হিংস্র মনকে নাড়া দিতে পেরেছিল, তেমনি সুলতানের হৃদয়কেও স্পর্শ করে এক অননুভূত আবেগ সৃষ্টি করল

একসময় গান থেমে গেল। বাঘ তখনো একই ভঙ্গিতে শুয়ে।

গান থামলে সুলতান সচেতন হলেন, বললেন, তোমার গান এত চমৎকার! কার কাছ থেকে এমন গান শিখেছ?

মেয়েটি বলল, এ গান আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি।

সুলতান বললেন, তুমি সাধারণ মেয়ে নও। আল্লার দয়ায় তোমার সাক্ষাৎ পেলাম।

তারপরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মেয়েটি খুব দরিদ্র ছিল তার বাবা মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, উঠতে পারত না। সুলতান বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে নিজের হাকিম কবিরাজ দিয়ে মেয়েটির বাবা-মায়ের অসুখ সারিয়ে দিলেন। তাদের বাড়ি-ঘর করে দিলেন তার বাবাকে তাঁর দরবারে চাকরি দিলেন।

তারপর কি করলেন?

সেই বাঘটার কি হলো?

সেই কথাই বলব।

বাঘটা ছিল বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। অদ্ভুত নেশায় নেশাগ্রস্ত বাঘটা প্রতি অমাবস্যার তিথিতে নরমাংস না পেয়ে হাঁক-ডাক শুরু করে দিত আর প্রতি অমাবস্যার রাতে ঐ মেয়েটি গান গেয়ে বাঘটাকে শান্ত করত। সংগীতের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত।

সুলতান তবু ঐ আদরের বাঘকে ছাড়তে পারেননি। তাই বাঘকে গান শোনাবার জন্য তিনি মেয়েটিকে পারিশ্রমিক হিসেবে মাসিক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

একদিন বাঘটা অসুস্থ হলো। কিছুতেই সুস্থ করে তোলা গেল না তাকে। এক সুন্দর সকালে বাঘটা মারা গেল। মৃত বাঘটাকে কবর দেওয়া হলো। কবরে মাটি দেওয়ার সময় মেয়েটি গান গেয়েছিল।

মহীশূরে তোমরা যদি কেউ যাও, এখনো সেখানে টিপু সুলতানের আদরের বাঘের সমাধি দেখতে পাবে। সেখানকার লোক বলে ওখানে নাকি প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই মেয়েটির অবিস্মরণীয় গান শুনতে পাওয়া যায়।

ছবি : শুকতারা রায়

[মহীশূরের টিপু সুলতানের একটা আশ্চর্য খেলনা বাঘ ছিল তৈরি করেছিল সম্ভবত কোনো ইউরোপীয় ঘড়িনির্মাতা। বাঘটার কবলে ছিল একটা মনুষ্যমূর্তি। খেলনাটা চালু করলেই বাঘটা লাফিয়ে পড়ত মানুষের উপর। বাঘ গর্জন করত আর মানুষটির শরীর থেকে বেরোত রক্ত। এই আদিম রোবটটি এখন রক্ষিত আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে। সম্ভবত এই পুতুলকে কেন্দ্র করেই জনশ্রুতিটি ছড়িয়ে পড়েছিল মহীশূরের গ্রামেগঞ্জে।]

সাবধানের মার

অনিশা দত্ত

তখন এম. এস-সি. পড়ি। রোজ দুপুর বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ক্লাস। ফেরার সময় সায়েন্স কলেজ থেকে এগারো নম্বর বাসে চেপে হাওড়া স্টেশন তারপর চারটে চল্লিশ, চারটে বাহান্ন বা পাঁচটা দু' মিনিটের লোক্যালে চেপে শ্রীরামপুর। তখন এত ভিড়ভাট্টা ছিল না। ব্রাঙ্ক গার্লসের বাসস্টপ থেকে বাসের দোতলায় চেপে, জানলার ধারেই বসতে পেতাম। হাওড়া পৌঁছেও, ঐ জানলার ধার টার্গেট করে স্থির করি, কোন লোকালে ফিরবো। সেদিন একটু আড্ডা মেরে ফিরতে দেরি হয়েছে। হাওড়ায় বাস থেকে নেমেই দেখি, বড় ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। পড়িমরি ছুট লাগিয়েছি। তখন সাবওয়ে ইত্যাদির ব্যাপার ছিল না। হাঁফাতে হাঁফাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই গার্ড লাল ফ্ল্যাগ নেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। ইলেকট্রিক ট্রেন হুইস্‌ল বাজিয়ে দুলে উঠল। সাধারণত লেডিস্ কম্পার্টমেন্ট থাকত তিনটে কামরা পরে। তখন তো আর খোঁজার প্রশ্ন নেই। ভয়ানক ঝুঁকি নিয়ে সামনের কম্পার্টমেন্টের দরজার হাতল ধরে ঝুলে পড়লাম। তুমুল কলরব উঠল প্লাটফর্মে ওই....ওই....ধর ধর.... গেল গেল....। মাথা ঘুরে উঠল। প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেয়েও বুঝলাম, নাঃ যাইনি, ধরতেও হয়নি, নিরাপদে উঠতে পেরেছি।

সারা কম্পার্টমেন্টে আর একটিও মেয়ে নেই। সকলের শাসনের কড়া দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে একটু ভেতরে ঢুকে হাঁফাতে লাগলাম। বুকের ধড়ফড়ানি আর থামতেই চায় না। প্লাটফর্মের দিকে জানলার ধারে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন, দয়াপরবশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, 'এস মা এস, এখানে ব'স।' তড়িঘড়ি তাঁরই পাশে বসা কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো আমারই মতন এক ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত স্বরে বলল, 'না না দাদু, আপনি বসুন, আমি উঠছি।' আজকাল অবশ্য এ ধরনের সৌজন্য চট্ করে চোখে পড়ে না, তবে আমাদের ছাত্রজীবনে, এটুকু শিষ্টাচার দুষ্প্রাপ্য ছিল না। আমার ভাগ্যে সেই জানলার ধারই পড়ল। আমার সারা শরীরের নার্ভ তখনও উত্তেজিত। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে শিথিল করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে তা আর ভেবে দেখবার মতন মানসিক অবস্থা ছিল না। একটা মেয়ে, এ ধরনের দুঃসাহসিক ঝুঁকি কেন নেয়, বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা, না কি গোঁয়ারতুমি, না নিছক নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি মন্তব্য ও আলোচনার ঝড় বয়ে যেতে লাগল।

আমার পাশের বৃদ্ধ আমার হাত ও গলা লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'গয়না পরে, কলেজ করার খুব একটা দরকার আছে কি? আজ তুমি খুব বেঁচে গেছ মানছি, কিন্তু ঐ সময় যদি কেউ তোমার গলার হার বা হাতের বালা ধরে টানত, তবে তো নির্ঘাত ট্রেনের তলায় যেতে। আসলে কি জান, সাবধানের মার নেই। সব সময়ে সাবধানে চলাফেরা করবে।' আমি তো চলন্ত ট্রেনে ওঠার জন্য এমনিতেই অপরাধী হয়ে রয়েছি। অতএব প্রতিবাদ করলাম না। তখন তো ছিনতাই-এর যুগ ছিল না। সোনার অমন আকাশছোঁওয়া দরও ওঠেনি। ফল্‌স্ গহনার চলই হয়নি তেমন।

আমার নীরবতায় খুশি হয়ে, যে ছেলেটি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতঘড়ি লক্ষ্য করে বললেন, 'রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-কলেজে, যাতায়াতের পথে, সময় জেনে নেওয়া কি এতই অসুবিধে যে কব্জিতে সর্বদা ঘড়ি না বাঁধলে চলে না?' তখনকার ছেলেরা গুরুজনের মান রেখে কথা বলত। তাচ্ছিল্য দেখিয়ে ফুঁসে ওঠার রেওয়াজ ছিল না। এখন কেউ ওভাবে কোনও তরুণকে বলার সাহসই করবেন না। ছেলেটি মুখ কাঁচুমাচু করে ক্ষীণস্বরে বলার চেষ্টা করল, 'না, মানে, ইয়ে.... ব্যস ঐটুকু। বৃদ্ধ তাকেও একরাশ উপদেশ দিয়ে, অন্য একটি ছেলের বুকপকেটে গোঁজা ফাউন্টেন পেনের দিকে নজর দিলেন।

'কি বাবা, তুমি কি ট্রেনে যেতে যেতেও লেখাটেখা অভ্যাস কর নাকি?' ছেলেটি হকচকিয়ে প্রথমে বুঝে উঠতেই পারেনি। ভদ্রলোক বিশদ হলেন, 'কলমটা ব্যাগের মধ্যেও তো রাখতে পার, ক্লাসে নোট নেওয়ার পর্ব তো শেষ হয়েছে। ট্রেনে চড়ার সময়, অহেতুক পকেটমারদের আস্কারা দেওয়ার দরকার আছে কি? সাবধান হতে ক্ষতি কি তোমার?'

সত্যিই তো আর পকেটমারের স্বপক্ষে রায় দেওয়া যায় না। ছেলেটি আমতা আমতা করল, 'মানে সকলেই তো রাখে, এটাই তো কলম রাখার সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা।' আমার কলমও শাড়িতেই আটকানো। ব্লাউজের সঙ্গে। বৃদ্ধ খেয়াল করলেন না।

একটু দূরে এক ভদ্রলোক বোধকরি দৈনিক অফিসযাত্রী হবেন, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, হাতে-ধরা ছাতা। ছাতা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরায় যে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা ঢের বেশি, বৃদ্ধ সেই ব্যাখ্যানা শুরু করলেন। ছাতা নিয়ে ভিড়ে অনুপ্রবেশ মানে, ছাতা একজন মানুষের জায়গা দখল করছে। অতএব, ছাতারও মাহুলি কাটা উচিত। সামনে একটি চশমাপরা অল্পবয়সী ছেলে দাঁড়িয়েছিল, ফস্ করে বলে বসল, 'আমাকে যেন চশমা খুলে রাখতে বলবেন না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব।' এক দফা হাসির রোল উঠল। বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই ছেলেটি হাতজোড় করে বলল, 'আমরা সবাই স্টুডেন্টস কনসেসনে কোয়ার্টারলি কাটি, মাহুলির চেয়েও সস্তা।'

বৃদ্ধ আবার ছত্রধারীকে উপদেশ-বর্ষণ শুরু করলেন। – 'ট্রেনে আপনি আগে ঢুকবেন না ছাতা? তারপর নিজের এবং ছাতার দুটি জায়গা দখল করবেন এবং নামবার সময়ে, ছাতা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনি ভুলে একাই নেমে যাবেন। বলুন দিকি সত্যি সত্যি, কতগুলি ছাতা এযাবৎ খুইয়েছেন?'

জানেন তো সাবধানের মার নেই।

ছত্রধারী বয়স্ক কথার পিঠে উত্তর দিলেন, 'দেখুন তো মশাই লক্ষ্য করে, আমি ছাড়া আর কেউ ছাতা নিয়ে ওঠেনি, কারণ হচ্ছে ছাতা নিয়ে চলাফেরা নিত্যযাত্রীদের মধ্যে সত্যিই অসুবিধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আমি নিরুপায়। স্টেশন থেকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। বারবার ছাতা হারালেও, বর্ষার সময়টুকু ছাতা বইবার কষ্ট স্বীকার করতেই হয়।'

এবার বৃদ্ধ বক্তিম্যার চশমা পরা ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখ বাপু, চশমা পরায় কোনো বাহাদুরি দেখি না। ছেলেবেলা থেকে চোখের যত্ন নাওনি, হয়তো বা নিজের অবহেলাতেই চোখ খারাপ করেছ। ছোটবেলা থেকে যথেষ্ট সাবধান হলে হয়তো চশমা তোমাকে নিতেই হতো না।'

হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। জানলা দিয়ে ছাঁট আসছে না বটে, তবে একঝলক ঠান্ডা হাওয়া সকলকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল আমার উল্টোদিকের জন গোড়া থেকেই চাদর জড়িয়ে বসেছিলেন আমি শাড়ির আঁচল জড়ালাম, ব্যাগ ঠিক করলাম রিষড়া স্টেশন পার হয়ে গেল, শ্রীরামপুর আসছে, নামতে হবে।

বৃদ্ধ হঠাৎ, 'আমার র‍্যাপার কই? র‍্যাপার?' চীৎকার করে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।–'এখানেই তো রাখা ছিল, আমার ডানপাশে, জানালার ওপর!' ডানপাশে তো আমি বসে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, কি জানি, বৃদ্ধের চাদরের ওপরেই বসে আছি না কি এতক্ষণ! কিন্তু কিছু নেই, সিট খালি।–'এ কি কান্ড, এখানেই তো ছিল, আমি জানলায় হাত রেখে বসেছিলাম, হাওড়া স্টেশনে, আমার ডান হাতেই তো ধরা ছিল। তবে কি, তবে কি....'

চশমাধারী ছেলেটি বলে উঠল, 'ব্যাপারস্যাপার আপনার ক্ষ্যাপার মতন দাদু, ঐ র‍্যাপারটাই গেছে হাওয়া হয়ে হাওড়া স্টেশনে। "ওই ওই....গেল গেল....ধর ধর...." চীৎকারটা ছিল, ওই র‍্যাপার-চোরের উদ্দেশেই! র‍্যাপারের ব্যাপারে গোড়াগুড়িই আপনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। জানেন তো সাবধানের মার নেই।'

ভদ্রলোক জানলা দিয়েঁ ফ্যালফ্যাল চেয়ে রইলেন। আমি নেমে গেলাম।

ছবি: সরোজ সরকার

বিশ্বকর্মার কাণ্ডকারখানা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

বছর আটেক বয়স হতে না হতেই বিশ্বকর্মার বাবা তার পৈতে দিয়ে দিলেন। পৈতের পরই তখনকার নিয়ম মতো তিনি বিশ্বকর্মাকে পাঠিয়ে দিলেন গুরুকুলে লেখাপড়া শেখার জন্য।

বিশ্বকর্মার নাম অবশ্য তখনও বিশ্বকর্মা হয়নি। প্রজাপতি ত্বষ্টার ছেলে বলে সবাই তাকে তখন ত্বাষ্ট্র বলেই ডাকত। গুরুকুলে ত্বাষ্ট্র যেমন লেখাপড়া শিখত তেমনি একসময় ভিক্ষেয় বেরিয়ে নিজের জীবন চালাবার মতো খাবারদাবার সংগ্রহ করে আনত, আবার সাধ্যমতো গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষা করত, আশ্রমের নানা কাজ করত। সব মিলিয়ে পরিশ্রমটা অনেক হলেও সংগীসাথীদের সংগে বিশ্বকর্মার দিনগুলো সেখানে বেশ ভালই কাটছিল।

এখন চিরদিন তো সবার সমান যায় না। বিশ্বকর্মারও হলো তাই। হঠাৎই মস্ত বিপদে পড়ে গেল বিশ্বকর্মা। হাজার ভাবনা চিন্তা করেও সেই বিপদ থেকে বের হবার কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না সে। যতই রাস্তা খোঁজে ততই যেন নানা চোরা গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়ে। তাতেই দারুণ ভয় পেয়ে যায় সে।

গ্রীষ্মকাল তখন শেষ হবার মুখে। আকাশে মাঝে মধ্যেই উঁকি মারছে দু একটা কালো মেঘ। মাঠের গরুও আকাশের দিকে মুখ তুলে হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ে। তাতে সবাই বুঝতে পারে বর্ষা এল বলে।

এই বর্ষা আসার মুখেই গুরুদেব একদিন ডাকেন বিশ্বকর্মাকে। বলেন, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

কাজের নামে বিশ্বকর্মা যেন এক পায় খাড়া। হাত জোড় করে বলে, বলুন গুরুদেব কী করতে হবে আমাকে?

গুরুদেব হেসে বলেন, না তেমন কিছু নয়, বর্ষা আসছে, তাই আমার জন্য একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে দাও।

বিশ্বকর্মা ভেবেছিল কি না কি কাজ দেবেন গুরুদেব। কিন্তু সামান্য একটা ঘর তৈরি করে দিতে হবে শুনে সে যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলে। বলে, বেশ তো গুরুদেব, নিশ্চয় করে দেব।

গুরুদেব বলেন, দেখ বাছা, এমন ঘর করবে যাতে সেটা কোনোদিন ভেঙে পড়বে না আর পুরনোও হবে না।

এবার একটু মাথা চুলকে বিশ্বকর্মা বলে, বেশ তাই হবে গুরুদেব।

গুরুদেব থামতে না থামতেই গুরু-মা বলেন, আমারও একটা কাজ করে দিতে হবে তোমায়। আমার জন্য একটা জামা বানিয়ে দেবে তুমি। জামাটা সুতোর কাপড় দিয়ে না বানিয়ে বল্কল দিয়ে বানিয়ে দিও বরং। তবে দেখ, বল্কলটা যেন সবসময় খুব সুন্দর আর খুব উজ্জ্বল থাকে। ওই সংগে দেখ, জামাটা যেন আমার গায়ে ঠিক ঠিক হয়। এতটুকু ঢিলে বা

আঁটসাটো যেন না হয় জামাটা।

বিশ্বকর্মা গুরুমাকেও প্রণাম করে বলে, বেশ তাই হবে।

এবার এগিয়ে এসে গুরুপুত্র বলে, তাহলে আমারও একটা ছোট কাজ করে দিও তুমি। আমার পায়ের মাপে এক জোড়া জুতো বানিয়ে দিও। জুতোটা এমন ভাবে বানাবে যাতে ওটা পরলে পায়ে এতটুকু কাদা না লাগে। তবে জুতোটা কিন্তু চামড়া দিয়ে বানাবে না আর ওটা পরে চলার সময় যেন খুব আরাম পাই। হ্যাঁ ভাল কথা, জুতোটা পরে আমি যেন জলে বা স্থলে সমানভাবে চলতে পারি সেটাও একটু দেখ, কেমন!

বিশ্বকর্মা মাথা নেড়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সময় পথ আগলে দাঁড়ায় গুরুকন্যা। তাকে দেখে বিশ্বকর্মা বলে, তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ, সবার জন্যই তো তুমি কিছু না কিছু করে দিচ্ছ। তা আমারও একটা ছোট্ট আবদার মেটাতে হবে তোমাকে।

কী?

আমার কানের মাপে দুটো দুল তুমি নিজের হাতে তৈরি করে দেবে আমাকে। আর আমার খেলার মতো কিছু হাতির দাঁতের খেলনাপাতিও বানিয়ে দিও। কখনও ভাঙবে না এমন কিছু মুষল উদূখলও চাই আমার। তাছাড়া না মাজলেও সবসময় চকচক করবে এমন কিছু থালাবাসন আমাকে বানিয়ে দাও। ওই সঙ্গে রান্না করাটাও এমনভাবে শিখিয়ে দাও যাতে আমার আঙুলও পুড়বে না অথচ রান্নাটাও হবে খাসা। আর একটা স্তম্ভের ওপর এমন একটা কাঠের বাড়ি আমাকে তৈরি করে দাও যেটাকে আমি অনায়াসে এখান থেকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব।

কাজের ফিরিস্তি শুনে বিশ্বকর্মার ততক্ষণে আক্কেল গুড়ুম। তবু সবার কথাতেই সে হ্যাঁ বলে। এর ওপর বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠীরাও যখন কিছু কাজের বরাত দিল তখন সত্যি খুব বিপদে পড়ল বিশ্বকর্মা। বিপদে পড়লেও সে কাউকে কিছু বলে না সবার কথা মেনে নিয়ে গভীর বনে চলে যায়।

নিমেষে সব কিছু করার বিদ্যেটা তখনও বিশ্বকর্মার রপ্ত হয়নি। সে দেবতাদের কারিগরের কাজটাও পায়নি। তাই এ সব কাজের কোনোটাই জানত না সে। অথচ গুরু, গুরুমা বা তাঁদের ছেলেমেয়েকে সেবা করাটাই হলো ধর্ম। কথা দিয়েও যে কথা রাখতে পারে না তার চেয়ে অধম আর কেউ নেই। তাই বিশ্বকর্মা বসে বসে শুধু ভাবে আর ভাবে।

বনের মধ্যে একলা বসে বিশ্বকর্মা ভাবতে থাকে, গুরু-সেবাই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম। গুরুদেবের কোনো কাজ স্বীকার করেও যে সেটা করে না তার চেয়ে পাপী আর কেউ নেই। অথচ আমি এমনই অজ্ঞ যে এসব কাজের কিছুই আমি জানি না। কোথায় গেলে কে আমাকে এসব শিখিয়ে দিতে পারে তা বলে দেবার মতো কাউকেও এ বনের মধ্যে আমি দেখছি না। হে বিধাতা, আমার কপালে যা লিখেছ তা তো হবেই। তাই আর কিছু না ভেবে আমি তোমারই শরণ নিচ্ছি। তোমার যা অভিরুচি তাই কর তুমি।

এসব বলে বিশ্বকর্মা যখন চোখের জল ফেলছে, সেই সময়েই সে একজন তাপসকে দেখতে পায়। তাঁকে দেখে বিশ্বকর্মার যেন ধড়ে প্রাণ আসে। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করে বলে, আপনি কে তা আমি জানি না। তবে এই মুহূর্তে একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারেন। আপনি যেই হোন, আমি আপনার শরণ নিচ্ছি, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তাটা আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন দয়া করে।

বিশ্বকর্মার আকুতিতে খুশিই হন তপস্বী। বিশ্বকর্মাকে আশীর্বাদ করে তিনি বলেন, জেনেও যে বিপন্নকে সঠিক পথের সন্ধান দেয় না তার চেয়ে পাপী আর কেউ নেই। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা যদি আমার জানা থাকে তাহলে নিশ্চয় তোমাকে জানাব। এখন বল, কী তোমার বিপদ?

বিশ্বকর্মা খোলাখুলি ভাবেই সবকথা জানিয়ে বলে, এখনো পর্যন্ত এ ধরনের কোনো কাজই আমি করিনি। কেমন করে করে তাও জানি না। তাই কার কাছে গেলে অল্পদিনের মধ্যে এসব শিখতে পারব তা যদি বলে দেন তাহলে বাধিত হব।

বিশ্বকর্মার বিনয়ে আরো খুশি হন তাপস। তিনি বলেন, দেখ এ সব কাজ তোমার অদ্ভুত বলে মনে হলেও আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। কাশী বিশ্বেশ্বরের যদি কৃপা হয় তাহলে তুমি অনায়াসে বিশ্বের যে কোনো কাজ করতে পারবে। চাই

আমারও একটা ছোট্ট আবদার মেটাতে হবে তোমাকে।

খুশি হয়ে শিব আবির্ভূত হন

কী তোমার নামই হয়ে যাবে বিশ্বকর্মা। তাই বলছি তুমি কাশীতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর–তোমার কার্য উদ্ধার হবেই।

তপস্বীর কথায় বিশ্বকর্মা বলে, দেখুন, আমি নেহাতই ছেলেমানুষে। কাশী কোথায় তা আমার জানা নেই। কেমন করে সেখানে যাওয়া যায়, কেমন করে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করতে হয় সবই আমার অজানা। আপনি যদি অনুগ্রহ করে পথটা আমার দেখিয়ে দেন তাহলে আমি চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

তপস্বী বলেন, এখন আমি কাশীতেই যাচ্ছি। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।

তপস্বীর কথা বিশ্বকর্মার কাছে গভীর অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল দীপশিখার মতো মনে হলো। তাই এতটুকু সময় নষ্ট না করে তপস্বীকে অনুসরণ করতে থাকে।

একসময় তারা কাশীতে পৌঁছে যায়। কাশীতে এসেই তপস্বী বলেন, এই হলো কাশী। এখানে তুমি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে মহেশ্বরের আরাধনা কর, তাহলেই তাঁর কৃপা হবে।

কথাগুলি বলেই সেই তপস্বী যেমন হঠাৎ বনের মধ্যে হাজির হয়েছিলেন তেমনি হঠাৎই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। তাঁকে আর দেখতে না পেয়ে বিশ্বকর্মা বুঝতে পারে স্বয়ং মহাদেবই তাকে কাশীতে নিয়ে এসেছেন কিভাবে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে তার উপায় জানাতে। মনে মনে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানায় বিশ্বকর্মা।

কাশীতে গঙ্গাস্নান করে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বকর্মা। তারপর সেই শিবলিঙ্গকে পূজা করে তারই সামনে বসে তপস্যা করতে থাকে সে। একদিন দুদিন নয়, তিন তিনটি বছর শীত গ্রীষ্ম বারো মাস একই ভাবে চলতে থাকে বিশ্বকর্মার শিব আরাধনা।

তিন বছর বাদে খুশি হয়ে শিব আবির্ভূত হন বিশ্বকর্মার সামনে। মধুর হেসে বলেন, বাছা, আমি তোমার তপস্যায় খুবই খুশি হয়েছি। আমি বর দিচ্ছি, যে কোনো উপাদান দিয়ে তুমি খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারবে। নিমেষে বানাতে পারবে মন্দির, অস্ত্রশস্ত্র সব। তুমিই হবে দেবতাদের কারিগর। আর আজ থেকে তোমার নাম হলো বিশ্বকর্মা।

শিবের বর পেয়ে বিশ্বকর্মা তো দারুণ খুশি। শিবকে প্রণাম করে বলে, চিরদিন যাতে আপনার পায়ে মতি থাকে এই বরই শুধু আমাকে দিন।

তথাস্তু, বলে শিব অন্তর্হিত হন। আর বিশ্বকর্মাও গুরুদেব, গুরুমা, গুরুপুত্র এবং গুরুকন্যার ফরমাশ মতো জিনিসগুলি তৈরি করে দেয় তাঁদের। সেই অপূর্ব জিনিসগুলি পেয়ে তাঁরাও দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতে থাকেন তাকে। তাঁরাও তাকে বলেন বিশ্বকর্মা।

ত্বষ্টৃ প্রজাপতির ছেলে ত্বষ্টা এইভাবে হয়ে যায় বিশ্বকর্মা। তাঁর মতো নিপুণ কারিগর আর কেউ নেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।

[কাহিনীসূত্র স্কন্দপুরাণ]

ছবি : সুফি

প্রাণী হত্যায় হিতে বিপরীত

পথিক মণ্ডল

আমরা প্রায়ই আমাদের চারপাশের প্রাণীদের উৎপাতে খুবই বিরক্তি বোধ করি। কাকের চৌর্যবৃত্তি বা কর্কশ ডাক, ইঁদুরের ফসল থেকে শুরু করে সবকিছু কেটেকুটে নষ্ট করার স্বভাব, সুখনিদ্রার সময় মশার কামড় আর খাওয়ার সময় মাছির ভনভনানি আমাদের উত্যক্ত করে তোলে। এদের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা নানারকম বিষাক্ত ওষুধ, মশা তাড়ানোর ধূপ, ইঁদুর মারার কলকব্জা ব্যবহার করি। এ ছাড়া বিড়াল, কুকুর, সাপ, পোকামাকড় এদেরও সবসময় তাড়া করি। কখনো বা মেরে ফেলি। প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা কিন্তু বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন, সমাজে কোনো প্রাণীই ফেলনা নয়, প্রত্যেকেরই কমবেশি প্রয়োজন আছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঠিক রাখতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে শুরু করে বৃহত্তর প্রাণী পর্যন্ত সবারই বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা ভুল করে অবুঝের মতো যেসব প্রাণী মেরে ফেলি পরে দেখা যায় তাদেরই অভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অতএব আমরা হিতের জন্য যে কাজ করি ঠিক তার বিপরীত ফল পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কিছু কিছু ঘটনা শুনলেই বোঝা যাবে প্রাকৃতিক সামারক্ষার্থে সব ধরনের প্রাণীরই বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে উত্তর আমেরিকার জামাইকা দ্বীপে ইঁদুরের উৎপাত এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে আখ-চাষীদের চাষ করা বড়ই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল জামাইকা দ্বীপে প্রধান কৃষিজ আখ। এই কারণে আখ-চাষীরা দল বেঁধে ইঁদুরের বংশ ধ্বংস করার যজ্ঞে

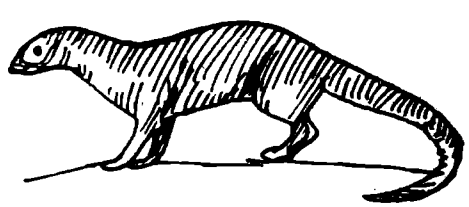

মেতে উঠলেন। তাঁরা অনেক চিন্তাভাবনার পর ঠিক করলেন বিড়ালের সংখ্যা বাড়িয়ে ইঁদুরদের দমন করবেন। কিন্তু অত বিড়াল একসঙ্গে যোগাড় করা মুশকিল দেখে অন্য দেশ থেকে বেশ তাগড়াই চেহারাঅলা কিছু বেজি তাঁরা আমদানি করলেন। সেইসব বেজি কেবল ইঁদুরই মারবে না সাপদেরও খতম করবে।

ছ'মাস কেটে গেলে দেখা গেল আখের ক্ষেতে কোনো ইঁদুরের উৎপাত নেই। আখ-চাষীরা বেজায় খুশি হলেন। সবাই যে যার ক্ষেতে বেজি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বছর দশ পরে বেজির সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে ক্ষেতের দিকে তাকালে

কেবলই বেজি দেখা যেত। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ হওয়ায় প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার আখ লোকসানের হাত থেকে বেঁচে গেল।

এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই বিপরীত ফলটা ফলতে শুরু করল। ইঁদুরের বংশ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বেজিরা আর ইঁদুর পেল না। খিদের জ্বালায় তখন তারা সাপ, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি যাকে সামনে পেল খেয়ে নিল। পরে হাঁস, মুরগী, পাখি ধরে খেতে শুরু করল তবু তাদের খিদে মিটল না। অগত্যা তারা কুকুর, বিড়াল, শুয়োর এমনকি বাছুর মেরেও খেতে লাগল। এ ছাড়া গাছের ফলমূল তো উদরস্থ করলই। সব দেখে চাষীদের মাথায় হাত!

পরে চাষীরা দেখলেন যেসব পাখিরা ফসলের ক্ষেতে উড়ে এসে অতিক্ষুদ্র পোকাদের খেয়ে নিত তাদের আর দেখা মিলছে না। এইসব পোকা ফসলের ক্ষতি করত। পাখিদের বেজিরা খেয়ে ফেলেছিল বলেই পোকাদের মেরে ফেলার কেউ থাকলো না। ফলে পোকারা মহাসুখে হু-হু করে বেড়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ফসলের চরম ক্ষতি হলো।

চাষীরা মাঠের হালচাল বুঝতে পেরে প্রচার করে দিলেন, বেজি খতম করো। শেষকালে সরকারী ঘোষণাপত্রে জানানো হলো, যিনি একটি বেজি মারতে পারবেন তাঁকে এক শিলিং পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক কসরৎ করে বেজিদের সব মেরে ফেলার পর জামাইকা দ্বীপের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হলো।

একবার এডেনে ইঁদুরের ভয়ানক প্লেগ হতে শুরু করল। মহামারী আটকাতে অন্য দেশ থেকে শত শত বেড়াল আনা হলো। ইঁদুর মরল ঠিকই কিন্তু দেখা গেল বেড়ালরা দল বেঁধে কাঁকড়া আর মাছ ধরে খাচ্ছে। শেষকালে এডেনে কাঁকড়া আর মাছের আকাল দেখা দিল। জায়গাটি ছোট ছিল বলে এক অভিযান চালিয়ে বেড়ালদের তাড়িয়ে মাছ আর কাঁকড়াকে রক্ষা করা হয়।

আর একবার লাব্রাডার উপদ্বীপে এত ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেল যে তাদের জ্বালায় বল্গা হরিণের দল সব পালিয়ে বাঁচতে চাইল। যেখানেই সবুজ ঘাস সেখানেই হরিণের দল আর সেখানেই যত ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুর বেড়ে যাওয়ায় বাজ, বনবিড়াল, খেঁকশিয়াল, নেকড়ে বাঘ এরাও সংখ্যায় বেড়ে গেল। কারণ এদের প্রিয় খাদ্যই ইঁদুর। ফলে ইঁদুরের সংখ্যা কমতে বেশি দিন লাগল না। বল্গা হরিণের দলও মনের সুখে লাব্রাডারের সবুজ জমিতে চরতে শুরু করল। কিন্তু এবার বিপদ এলো অন্যভাবে। নেকড়ে বাঘেরা ইঁদুর না পেয়ে বল্গা হরিণদের মারতে শুরু করল। তখন হরিণরা আবার এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। মানুষদেরও নেকেড়ে বাঘের ভয়ে ঠিকমত জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

একসময় মাডাগাসকার দ্বীপে কয়েকজন জেলের মাথায় নতুন খেয়াল চাপল নদীতে কিছু গোল্ড ফিশ অর্থাৎ সোনালী মাছ ছেড়ে দেবেন। এর ফলে নদীর শোভা বাড়বে। আমরা এ্যাকোয়েরিয়ামে গোল্ড ফিশ পুষতে দেখি,কেউ কেউ বাড়িতে বড় বড় চৌবাচ্চায় গোল্ড ফিশের চাষ করে। নদীতে গোল্ড ফিশদের ছাড়ার ফলে দেখা গেল তাদের গায়ের রঙ কিছুটা ধূসর হয়ে গেছে। তারপর কিছুদিন যেতে তাদের সংখ্যাও বাড়ল। তারা অন্য ছোট মাছদের গপাগপ খেতে শুরু করল। শেষকালে নদীতে গোল্ড ফিশ ছাড়া আর অন্য মাছের দেখা মিলল না। জেলেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

এভাবে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে প্রকৃতির ওপর মানুষের মাতব্বরি প্রকৃতি কিছুতেই সহ্য করেনি। প্রতিশোধ নিয়েছে। ভাল ফল পাওয়ার আশায় মানুষ বরং মন্দ ফলই পেয়েছে। সাম্য ফিরিয়ে আনতে প্রকৃতির মধ্যেই ঘটে গেছে ওলটপালট নানা বিপর্যয়। সবক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রকৃতির কাছে মানুষ পরাজিত হয়েছে। মানুষ হিত কামনায় প্রাণীনিধন চালিয়ে বিপরীত ফল পেয়েছে।

আমাদের আশেপাশের ছোট, মাঝারি, বড় সব ধরনের প্রাণী কোনোটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। সরাসরি এদের থেকে আমরা তেমন কোনো উপকার হয়তো পাই না, কিন্তু অন্যভাবে এরা আমাদের উপকার করে। কাক, চিল, শকুন, মশামাছি, কোনোটাই বিনা প্রয়োজনে প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয়নি। বরং দেখা গেছে প্রকৃতিতে যার সব রকম প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে সে আপনিই শেষ হয়ে গেছে।

এইভাবে প্রকৃতি থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে অনেক প্রাণী। আর এখনো পর্যন্ত যারা বেঁচেবর্তে আছে তাদের প্রকৃতিতে কমবেশি প্রয়োজন রয়েছেই।

ছবি: সুফি

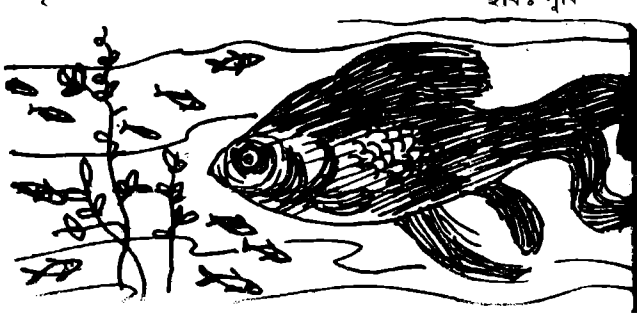

আপনার সোনামণিকে যখন স্কুলে পাঠাবেন, দ্বিগুণ লাভ সঙ্গে দেবেন !

সুস্বাদ + পুষ্টি দেয় বনি মিক্স !

সেরা পুষ্টি যোগালেন মানে বাচ্চার প্রতি আপনার অর্ধেক দায়িত্ব সারলেন। হ্যাঁ, আপনার বাচ্চাকে রোজই দিন দু' রকম লাভদায়ক বনি মিক্স। এতে আছে মুখরোচক আপেল, আম, খেজুর, কিশমিশ ও বাদাম, আর বাছাইকরা খাদ্যশষ্য – গম, চাল ও ভুট্টা। অর্থাৎ বনি মিক্স থেকে আপনার বাড়ন্ত বাচ্চা পায় বাড়তি পুষ্টি, যা তার দরকার !

আর তৈরী করাও কত সোজা !

রান্নার ঝামেলা নেই।

শুধু – একটি কাঁচের বাটিতে প্রয়োজনমতো বনি মিক্স ঢালুন . . .

ওতে আগে থেকে ফোটানো দুধ মেশান আর আলতো নেড়ে-নেড়ে মিহি ক্রীমওয়ালা মালাইয়ের মত পরিজ্ বানান !

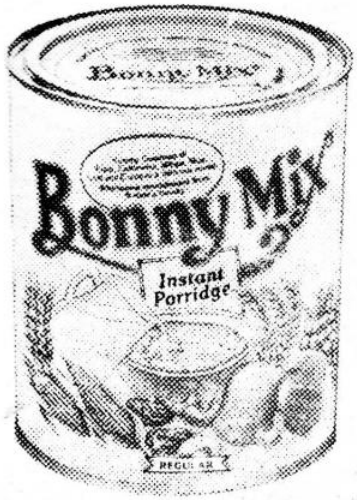

গ্ল্যাক্সো-সুস্বাস্থ্যের উৎস !

GI/3/69-R-BEN

বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

চরণ দাস

বিপ্লবী আন্দোলনে মেদিনীপুরের নাম সবার আগে লেখা হবে। ক্ষুদিরামকে দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু তার শেষ হয়েছিল মাতঙ্গিনী হাজরাকে দিয়ে।

সশস্ত্র বিপ্লবে লাগত অস্ত্রশস্ত্র। বিদেশ থেকে তা আমদানী করা সহজ কাজ ছিল না। তাতে যেমন অর্থের প্রয়োজন অনেক, তেমনি সরকারের নজরে পড়াও সহজ। এই সমস্যার সমাধান হবে যদি অস্ত্র এদেশেই তৈরি করা যায়। তখনকার দিনে বন্দুক পিস্তলের থেকে প্রথম প্রয়োজন ছিল বোমার। অতি আধুনিক বোমা। তাই তৈরি করতে হবে এদেশে।

মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের ছেলে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো একটু অন্য ধরনের তাঁদের বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। লেখাপড়া জানা ছেলে তার ওপরে দারুণ ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা ছবির প্রশংসা সবার মুখে। সেই হেমচন্দ্রের মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। দেশের পরাধীনতা তাঁকে ব্যথা দেয়। তিনি ভাবেন কি করে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। বিপ্লবই যে একমাত্র মুক্তির উপায় সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই বিপ্লব ঘটানো সম্ভব কিভাবে? তাঁর এই চিন্তাই তাঁকে নিয়ে গেল অরবিন্দের কাছে। অরবিন্দের সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝলেন এদেশে বিপ্লব ঘটাতে হলে, বিদেশের বিপ্লবীদের কাছ থেকে আন্দোলন পরিচালনার উপায় শিখতে হবে। শুধু কি তাই, বিদেশ থেকেই শিখে আসতে হবে বোমা, হাতবোমা, টাইম বোমা তৈরির আধুনিক

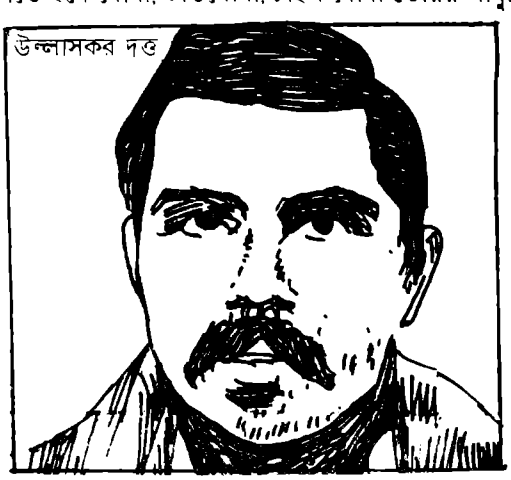
উল্লাসকর দত্ত

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো

পদ্ধতি।

হেমচন্দ্র মনে মনে স্থির করে ফেললেন তিনি বিদেশে গিয়ে বিপ্লব সংক্রান্ত পাঠ নেবেন। বোমা ইত্যাদি তৈরি শিখবেন। বিদেশ থেকে কিভাবে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা যায়, তারও খোঁজ খবর নেবেন।

প্রচুর টাকা দরকার ওঁর এই কাজে। তিনি কলেজিয়েট স্কুলে কাজ নিলেন। সেখান থেকে গেলেন জেলাবোর্ডের অফিসে কাজ করতে। এমনকি তিনি যে চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন, সেই ছবি আঁকাও অন্যকে শিখিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে টাকা জমিয়ে তিনি বিদেশ যাবার জন্য তৈরি হলেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর মামার-বাড়িতে গোপনে বিপ্লবীদের নিয়ে একটা আড্ডা বানিয়েছেন। আরও টাকার প্রয়োজনে তিনি এক জমিদারের সঙ্গে মিলে একটা সোডা লেমনেডের কারখানা খুললেন। সেই সোডা লেমনেড এতই ভাল ছিল যে স্থানীয় সাহেবসুবোরাও তাই কিনে খেত। টাকা জমলে তিনি ছবি আঁকা শেখার নাম করে প্যারিসে গেলেন। সেখানে দু বছর থেকে দেশে ফিরলেন ১৯০৮ সালে।

দেশে ফিরেই তিনি পুরোপুরি বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। মানিকতলার মুরারীপুকুরের এক বাগানবাড়িতে তৈরি হলো বোমা তৈরির কারখানা।

এতদিন বিপ্লবীরা যে সব বোমা ব্যবহার করতেন সেগুলো ছিল নেহাতই কমজোরী বোমা। এইবার মুরারীপুকুরের কারখানায় হেমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তৈরি হতে থাকল আধুনিক বোমা। তাঁর প্রধান সহকারী উল্লাসকর দত্ত।

অরবিন্দ তখন বিপ্লবীদের নেতা। তাঁর আদেশেই সেই বোমা কোথায় কোথায় কাজে লাগান হবে তা ঠিক হতো গুপ্তসমিতির গোপন সভায়।

লাটসাহেব ফুলারকে হত্যা করার জন্যই তাঁর বোমা প্রথমে কাজে লাগান হবে ঠিক হয়েছিল। হেমচন্দ্র নিজে গিয়েছিলেন সেই কাজের জন্য। কিন্তু সুযোগের অভাবে তা সফল হলো না।

এর পরেই গোপন সভায় ঠিক হলো কিংসফোর্ডকে হত্যা করা হবে। কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে। মুরারীপুকুর

কারখানায় হেমচন্দ্র আর উল্লাসকর দুজনে বোমা তৈরি করলেন। এখন এমন কজন বিপ্লবী চাই যাঁরা সেই বোমা ব্যবহার করে প্রতিশোধ নেবেন। হেমচন্দ্র উপযুক্ত লোক খোঁজা শুরু করলেন। আগে একবার বই বোমা পাঠিয়ে তাতে কোনও কাজ হয়নি। যার উদ্দেশে সে বই পাঠান হয়েছিল সন্দেহ হওয়াতে সে সেটা খুলে দেখেনি। তাই এমন কজন বিপ্লবী চাই যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বোমা ছুঁড়ে কাজ হাসিল করবেন।

অনেক চিন্তাভাবনার পর একজনকে পাওয়া গেল, যাঁর ওপর বিপ্লবীরা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারেন। নাম তাঁর প্রফুল্ল চাকি। কিন্তু তাঁর সংগী হবেন কে?

একদিন হেমচন্দ্র তাঁর কাজে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় এক বার-তের বছরের ছেলে এসে তাঁরে সংগে দেখা করলেন। ছেলেটি তাঁকে বলল, সে এসেছে সাহেব মারার জন্য রিভলবার চাইতে। অবাক হেমচন্দ্র তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ছেলেটি বলেছিল তার নাম ক্ষুদিরাম। হেমচন্দ্র মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, প্রফুল্ল চাকির সংগী হবে ক্ষুদিরাম।

এরপরে যা ঘটেছিল মজঃফরপুরে সে তো ইতিহাস।

মুরারীপুকুরের গোপন ঘাঁটি পুলিশ ভেঙে দিলে ধরা পড়লেন বহু বিপ্লবী। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারে কেউ কেউ রাজসাক্ষী হলেন। কেউ গোপনে পুলিশের সংগে সহযোগিতাও করলেন। বিচারের নামে চিরকাল ইংরাজ সরকার বিপ্লবীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাঁদের মানুষ বলেই মনে করেনি। যা খুশি তাই করেছে।

বিপ্লবীরা পুলিশের অত্যাচারে তাদের কাছে বৈপ্লবিক কাজের কথা প্রকাশ করে দিচ্ছিলেন। হেমচন্দ্রের মোটেও তা পছন্দ হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন, এর ফলে আন্দোলনের অনেক ক্ষতি হবে। যখন শুনলেন, নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়েছে তখন তাকে জেলের মধ্যেই শেষ করে দেবার যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল হেমচন্দ্রও ছিলেন সেই পরিকল্পনার একজন প্রধান। এই কাজ করা হয়েছিল অরবিন্দ বারীন্দ্রের অজ্ঞাতেই।

বিচারের প্রহসনের শেষে অনেকের প্রাণদন্ড হলো। অনেককে পাঠান হলো আন্দামানে। হেমচন্দ্র ১৯০৯ সালের ১২ ডিসেম্বর 'মহারাজা' জাহাজে চড়ে দ্বীপান্তরে যাত্রা করলেন।

প্রায় দশ বছর আন্দামানে বন্দী জীবন কাটানোর পর ১৯১৯ সালে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো দেশে।

ভারতবর্ষে তখন গান্ধীর যুগ শুরু হয়ে গেছে। দেশে ফিরে হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হলেন। তিনি গান্ধীজীর চরকা, খদ্দর আর অহিংস অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা।

বিপ্লবী দলগুলোও তখন আর নেই। বিপ্লবীদের অনেকেই সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কেউ কেউ যোগ দিয়েছেন গান্ধীর আন্দোলনে।

হেমচন্দ্র নিজের দেশে ফিরে একবারে নিঃসংগ হয়ে পড়লেন। তিনি এই সময় 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' নামে

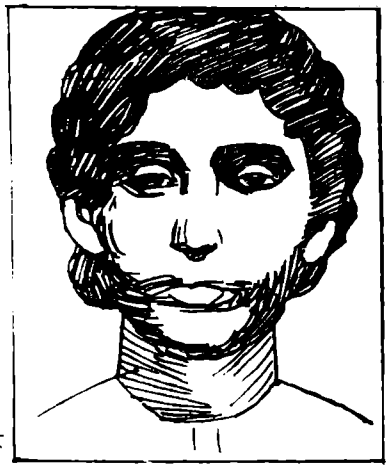

ক্ষুদিরাম

একখানা প্রামাণ্য বই লেখেন। লেখেন, 'অনাগত সুদিনের তরে'।

হেমচন্দ্র দেশের মংগল ছাড়া আর কিছুই চাইতেন না। এ ব্যাপারে কারও সংগে তিনি আপস করতে রাজী ছিলেন না। রাজনৈতিক মতবাদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন উগ্রপন্থী

মাদাম কামা বিদেশে যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন তখন যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তিনি স্বাধীন ভারতের পতাকা বলে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, সেই পতাকা হেমচন্দ্রই এঁকে

প্রফুল্ল চাকি

দিয়েছিলেন সেই পতাকাই ইউরোপীয় বিপ্লবী সভায় প্রথম স্বাধীন ভারতের নাম নিয়ে তোলা হয়েছিল। পরে তারই আদর্শে স্বাধীন ভারতের পতাকা তৈরি করা হয়।

শেষ জীবনে হেমচন্দ্র বড়ই একা হয়ে পড়েন। এমনকি স্ত্রী-পুত্রদের সংগেও তাঁর তেমন বনিবনা হতো না। তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। নিরালায় একাই তাঁর শেষ জীবন কাটে। পড়ে গিয়ে কোমরে আঘাত পেয়ে মেদিনীপুর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর আঁকা কিছু ছবি এখনও মেদিনীপুরের কারও কারও বাড়িতে আছে। তাঁর নকশায় তৈরি কিছু বাড়ি এখনও মেদিনীপুর শহরে দেখা যায়। স্বাধীন ভারতে এই মহান বিপ্লবীর নাম আর আজকাল কেউই মনে করে না।

ছবি: লেখক

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

দেখতে দেখতে আবার পুজো এসে গেলো। চারদিকে পুজোর প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে। পালমশাইরা ঠাকুর গড়ছেন, ডেকরেটাররা পুজো মন্ডপ তৈরির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, ফুলের ব্যাপারীরা পদ্মফুল থেকে আরম্ভ করে সব রকম ফুল যোগান দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, দোকানে-দোকানে নতুন জামা-কাপড়-জুতো—সব মিলিয়ে চারদিকে কেমন যেন একটা পুজো পুজো গন্ধ।

এই সময়টা ভীষণ ভালো লাগে না ? মেঘভরা আকাশের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় শরতের নীল আকাশ, ফুটতে শুরু করছে শিউলি, বনে-বাদাড়ে কাশ ফুল আনন্দে মাথা নাড়ছে। মা আসছেন—এ সবই যে তারই প্রস্তুতি। শুকতারাও তৈরি হচ্ছে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠার আগে তোমাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্যে। সত্যি, এবারের পুজো সংখ্যা সব দিক দিয়েই দারুণ হচ্ছে। সম্পূর্ণ উপন্যাস, গল্প, মজার মজার লেখায় ঠাসা বিশাল এই সংখ্যাটি নির্ঘাৎ তোমাদের মন ভরিয়ে দেবে। তোমরা যা যা চাও সবই পাবে এবারের পুজো সংখ্যায়। কি কি থাকছে জানার জন্যে নিশ্চয়ই তোমরা ছটফট করছো। সে আমি জানি। কিন্তু বলবো না তো ! তাহলে আসল সারপ্রাইজটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই না ?

তোমাদের অনেকেই দেবী দুর্গার সঙ্গে কেন অসুর থাকে জানতে চেয়েছো। কেউ কেউ লিখেছো, মা দুর্গার সঙ্গেই তো অসুরের লড়াই হলো, তাহলে কেন মায়ের সঙ্গে অসুরও পুজো পায় ! আসলে অসুর তো মহিষাসুর। দেবী তাঁকে তিনবার বধ করেছিলেন। প্রথমবার দেবীর রূপ ছিলো অষ্টাদশভুজা উগ্রচন্ডা, দ্বিতীয় আর তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গা। মহিষাসুর রাত্তিরে স্বপ্নে ভদ্রকালীর মূর্তি দেখে তাঁর আরাধনা করেছিলেন। তাই মহিষাসুরকে মারার পর দেবী তাঁর কাছে গেলে মহিষাসুর তাঁর পদবন্দনা করে বলেছিলেন, মা তোমার হাতে মরার জন্যে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আমি চাই তোমার পায়ের তলায় থেকে তোমার সঙ্গে পূজিত হতে। কেউ যেন তোমার কাছ থেকে আমায় আলাদা করতে না পারে।

করুণাময়ী দেবী দুর্গা বললেন, তাই হবে। উগ্রচন্ডা, ভদ্রকালী আর দুর্গা—এই তিন মূর্তিতেই তুমি আমার পদলগ্ন হয়ে চিরকাল দেবতা, মানুষ আর রাক্ষসদের কাছ থেকে পূজা পাবে।

সত্যযুগে সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্য দুর্গামূর্তি তৈরি করে তিন বছর পুজো করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ চৈত্রমাসে অর্থাৎ বসন্তকালে এঁর পূজা করতেন। এখনকার বাসন্তীপূজাই রাবণ প্রবর্তিত পূজা আর রাবণ বধের মানসে মা দুর্গার আশীর্বাদ পাবার জন্যে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল বোধন করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেই অকাল বোধনই আজকের এই দুর্গা পুজো। যার প্রস্তুতি এখন চলছে সব জায়গায়। তোমরাও নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছো। দুর্গাপুজো তো বাঙালীর জাতীয় উৎসব। এর আকর্ষণ, এর মেজাজ, এর মর্যাদাই আলাদা। তাই দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করেই বের হয় পূজা সংখ্যা। পুজোর সময় শুকতারার পূজা সংখ্যা—সত্যিই এ এক আলাদা আনন্দ।

সে যাই হোক, এবার আসি তোমাদের কয়েকজনের চিঠির ব্যাপারে। প্রথমেই বলছি শুকতারার বন্ধু আশুতোষ ভট্টাচার্যর (সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ, আসাম) কথা। আশুতোষ পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করেছে। এসো সবাই মিলে ওকে অভিনন্দন জানাই, সেই সঙ্গে বলি আশুতোষ তোমায় আরো ভালো রেজাল্ট করতে হবে ! শুকতারার বন্ধুরা যে তাই চায়। শুকতারায় তুমি যা যা চেয়েছো সেগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হচ্ছে। এবার আসি বর্ধমান, ছোটনীলপুর (পশ্চিম) থেকে লেখা দেবাশিস দাসের চিঠির প্রসঙ্গে। দেবাশিস তোমার চিঠি পড়ে আমার যেমন কষ্ট হয়েছে তেমনি অবাকও হয়েছি। তোমার কেন বন্ধু থাকবে না ? শুকতারার বন্ধুরাই যে তোমার বন্ধু। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, তাহলে তুমি মোটেই আর একা থাকবে না ! পুষ্পিতা বসাক (ঠিকানা নেই)। পুষ্পিতা ঠিকানা দাওনি কেন ? তা তোমার ইচ্ছে মতো এখন তো শুকতারার প্রত্যেক সংখ্যায় গোয়েন্দা গল্প পাচ্ছো। ব্যায়ামের ব্যাপারে শুকতারার ঠিকানায় তুমি তুষার শীলকে চিঠি দিও। উনি তোমায় সব জানিয়ে দেবেন। কেমন ! তাপসকুমার দে (কেশবডিহি, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)। বাবাঃ, কী রাগই না তুমি করেছো। কিন্তু তাপস তোমায় যে আরো ভালো লিখতে হবে। দাদুমণির কাছে শুকতারার বন্ধুরা সকলেই সমান তাই না। সেইজন্যেই তো দাদুমণি নিশ্চিন্তে তোমাদের লেখার মধ্যে থেকে খুব ভালোগুলোই শুধু বেছে নিতে পারে। জয়া ভট্টাচার্য (তুরাটাউন হাইস্কুল, তুরা, পশ্চিম গারো পাহাড়, মেঘালয়)। জয়া তোমার চিঠি পেয়ে ভীষণ খুশি হয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই লেখা পাঠাবে। শুকতারা যে তোমাদেরই কাগজ ! কবিতা রক্ষিত (১৬/১ সি, রাজা মণীন্দ্র রোড, পাইকপাড়া, কলকাতা-৩৭)। কবিতা তোমার ধাঁধার উত্তর হলো—আনারস। ঠিক হয়েছে তো ? পারলে না তাহলে দাদুমণিকে জব্দ করতে ! সঞ্জয় মঞ্জরেকারের ছবি ছাপা হয়েছে। দেখেছো নিশ্চয়ই। মৈত্রেয়ী (সতাভারতী বালিকা বিদ্যাপীঠ, কোন্নগর)। পদবী দাওনি কেন মৈত্রেয়ী ? তোমার গাছ লাগানোর খবর পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলবো। তুমিই বলো, নিজের হাতে পোঁতা গাছে যখন বাগান আলো করে ফুল ফোটে তখন কি আনন্দই না হয়। মৈনাক বল্লভ (৮, শিবদাস ভাদুড়ি স্ট্রীট, কলকাতা-৪)। মৈনাক তুমি নিশ্চয়ই লেখা, ছবি সব পাঠাবে। এই চিঠি যেভাবে পাঠিয়েছো সেইভাবে পাঠালেই চলবে। তুমিও অনেক গাছ লাগিয়েছো জেনে খুশি হয়েছি। আরো গাছ লাগাও মৈনাক। বন্ধুদেরও বলো।

আর জায়গা নেই। আজ তাহলে এই পর্যন্তই।

ভালো থেকো সকলে।

অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয়হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি।

তোমাদের পাতা

ডাক্তার এবং রোগী

একবার একটা লোকের খুব পেট ব্যথা করছিল। তাই সে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তারখানায় অনেক রোগীর ভিড় হয়েছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর লোকটার পালা এল ডাক্তারের কাছে যাবার। সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার ব্যথার কথা জানাল। ডাক্তার তাকে একটা ঔষধ দিয়ে বললেন, 'এই ঔষধটা আপনি প্রত্যেকদিন তিন চামচ করে খাবেন।' তখন লোকটা বলল, 'আমার বাড়িতে মাত্র একটা চামচ আছে।'

সুস্মিতকুমার ঘোষ, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, হলদিয়া।

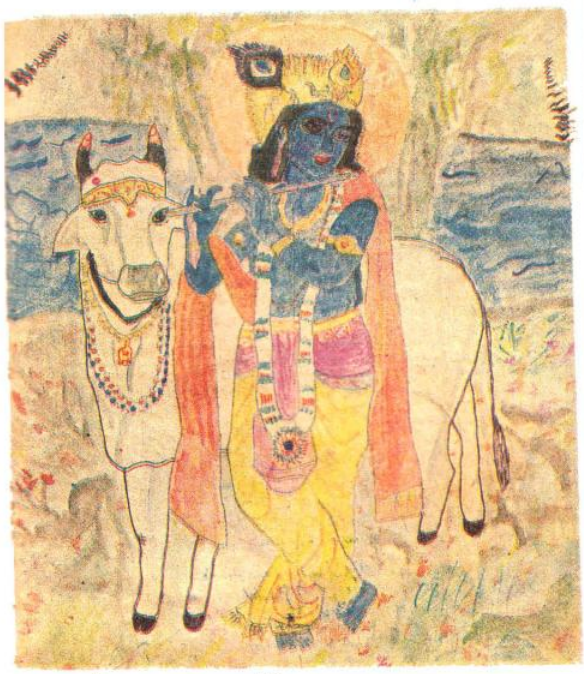

দুর্গানারায়ণ চক্রবর্তী, বয়স চোদ্দ অষ্টম শ্রেণী
বদনগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হুগলী

শ্রীকান্তকুমার মণ্ডল, বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী
হরিণবাড়ি হাই স্কুল হরিণবাড়ি, ২৪ পরগনা

ন্যাড়াবাবু

বাদলা দিনে পুকুর পাড়ে
ন্যাড়া ধরছে মাছ
সে দেখেনি মাথার উপর
মস্ত যে বেলগাছ।
ন্যাড়াবাবু ছিপ ফেলিয়া
ধরলো যে রুই মাছ
মাছ ধরিয়া ন্যাড়াবাবুর
ধিন তা ধিনা নাচ।
এমন সময় উপর থেকে
পড়লো যে এক বেল
বেলের বাড়ি খেয়ে ন্যাড়া
হলো যে ঘায়েল।

সৌগত নন্দী
বয়স নয়, পঞ্চম শ্রেণী, নদীয়া

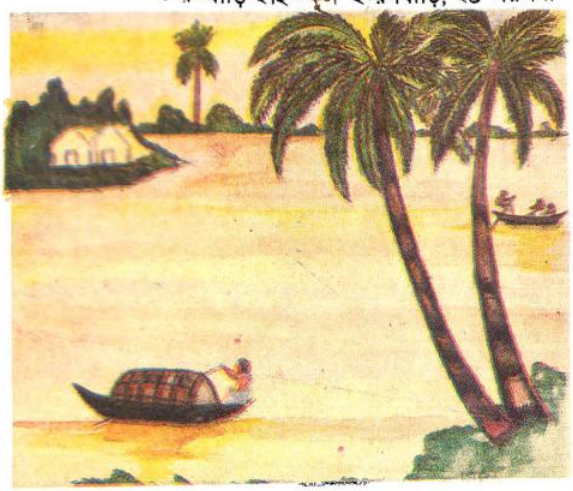

পার্থ সাহা, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, কোচবিহার

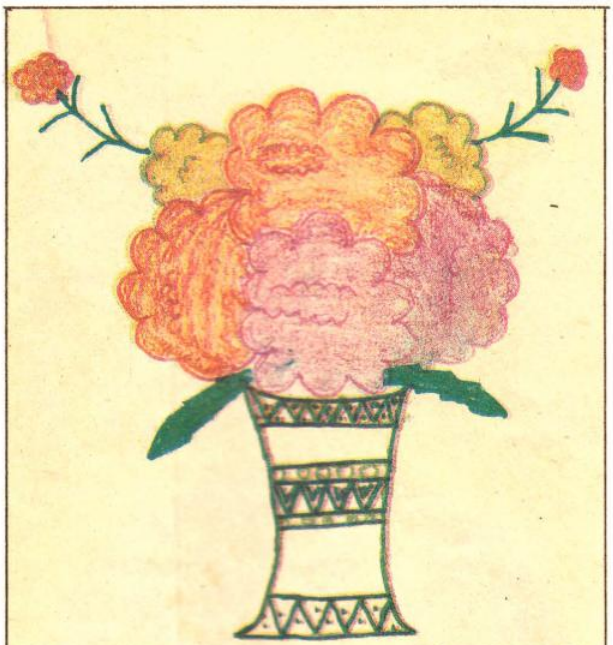

অজিতা চক্রবর্তী,
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী, শিশু শিক্ষায়ণ, শ্রীরামপুর

আজগুবি

খেয়ে দেয়ে কালকে রাতে
দাঁড়িয়ে ছাদের 'পরে,
দেখি মামদো ভূতগুলো সব
কেমন আমোদ করে!
তাই দেখে ঠকঠকিয়ে
কেঁপেই মলাম ভাই,
মনে হলো এক ছুটেতে
ঘরের পানেই যাই।
কিন্তু যে হায় পা দুটো তো,
থেমেই গেছে ভয়ে
সেকারণেই তখুনি তো
পড়ি অজ্ঞান হয়ে।
জেগে উঠেই দেখি একি,
এখন ভোরের বেলা!
থেমে গেছে গত রাতের
সব ভূতেদের খেলা।

বিক্রমজিৎ দাস,
বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী,
বালিগঞ্জ রাষ্ট্রিয় উচ্চ বিদ্যালয়,
কলকাতা।

শ্রীমন্ত শূর,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
সাকচী উচ্চ বিদ্যালয়,
টেলকো জামশেদপুর

রূপকথার দেশে

নীল আকাশের শেষে,
রূপকথার এক দেশে,
পরীর মেয়ে খেলা করে
আপন মনে হেসে॥
প্রজাপতি ডানা মেলে,
ঘুরে বেড়ায় ফুলে ফুলে,
প্রাণ জুড়ানো স্নিগ্ধতা এক
আসে হাওয়ায় ভেসে॥
সবুজ ঘাসে ঘাসে,
ফড়িং এসে বসে,
আনন্দেতে গান গায়
আর ল্যাজ দুলিয়ে নাচে॥

এক নাম-না-জানা পাখি,
মিষ্টি সুরে ডাকি,
কোথা থেকে ছুটে আসে
পরীর মেয়ের কাছে॥
মধুর গন্ধ পেয়ে,
মৌমাছিরা ধেয়ে,
সুদূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে
দল বেঁধে সব আসে॥
এদিক ওদিক দেখে,
হাসি হাসি মুখে,
দীঘির কাছে ছুটে গিয়ে
পদ্মফুলে বসে॥

মারুফা খাতুন,
বয়স সতেরো, দ্বাদশ শ্রেণী, টেঁপুর নবাসন অনন্তরাম উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া

অরুণিমা মণ্ডল, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
সি. এইচ. এস (ই. এম), চিত্তরঞ্জন

বাহাদুর বেড়াল

এই লক্ষ্যবিদ্ধ করার খেলাটা আমাদের হলে কেমন হয়, লট্‌কা!
ঠিক, পট্‌কা!
এখান থেকে কেটে পড়ো! ঐ বোর্ডটা আমার চাই!
পাজি হতচ্ছাড়ারা! আমরা এজন্যে ওদের মজাটা টের পাইয়ে দেবো!
আমি জানি কোন জাহাজ থেকে ওরা এসেছে।
ডক
যখন নাবিক দুজন ওদের জাহাজে এসে উঠলো—
ওদের হাতকড়া লাগাও!
হ্যাঁ, স্যার!
কিন্তু আমরা কি করেছি?
তোমরা এখানে নজর রাখার জন্যে ছিলে। জাহাজের স্টিয়ারিং হুইল কোথায়?
হাঃহাঃ! এটাও ঠিক ছোট বর্শা ছুঁড়ে খেলার মতোই, কিন্তু এটা আরো অনেক বেশী উদ্দীপক!
10
25
50
75
100
5
20

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

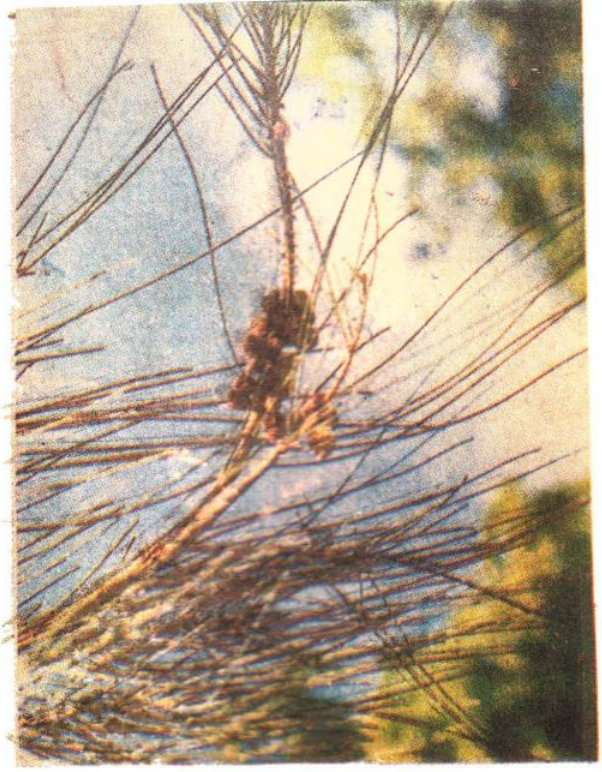

নাইট্রোজেনের নতুন কথা

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৭৮ ভাগ। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ পরিবেশের এই গ্যাসীয় নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। অথচ জীবদেহ গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই নাইট্রোজেন–যা প্রোটিনের অন্যতম উপাদান। উদ্ভিদ মাটির নাইট্রোজেন লবণ থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং প্রাণীরা উদ্ভিদ থেকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবাণুরা গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে মাটিতে বা উদ্ভিদের মূলে নাইট্রেট রূপে আবদ্ধ করে আমাদের সহায়তা করে। সম্প্রতি বেরিলি কলেজের উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডি. কে. সাক্সেনা, এভরিম্যান সায়েন্স পত্রিকায় তাঁর লিখিত নিবন্ধে জানিয়েছেন ক্যাসুরিনা বা ঝাউ গাছের আছে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা। নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের মধ্যে ঝাউ আমাদের প্রচুর উপকার করে।

মরচে রুখতে তেল!

মরচে ধরলে যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে অনেক অমূল্য জিনিস নষ্ট হয়। মরচে রোখার জন্য দিল্লীর একটি সংস্থা একটি তেল আবিষ্কার করেছেন। তেলটির নাম Power Top—SB। এ কথা জানিয়েছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস ফাইন্ডার নামে একটি জর্নাল।

স্বপ্নের ভিডিও ফোন!

টুম্পার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে বুবাই। মনে মনে ভাবছে, আহা টুম্পাকে যদি দেখতে পেতাম। একই কথা ভাবছে টুম্পা। টুম্পা-বুবাই-এর মতো অনেকেরই ইচ্ছাপূরণ ঘটবে এবার। তার সূত্রপাত হয়ে গেল এ বছরের জানুয়ারীর ৬ তারিখে। নিউইয়র্কে মার্কিন কোম্পানি AT & T তাঁদের ভিডিও ফোন প্রদর্শন করলেন। ফ্যাক্স মেশিনের চেয়ে দ্রুত এবং টেলিভিসনের চেয়ে বেশি কার্যকরী এই ভিডিও ফোন। যদিও এই যন্ত্রে এখনো কিছু ত্রুটি আছে। ছবি কাঁপে, তবুও ইচ্ছে করলে বাড়িতে লাগান যায়। বর্তমানে বাজারদর মাত্র ৩৬,৪০০ টাকা ভারতীয় মুদ্রায়।

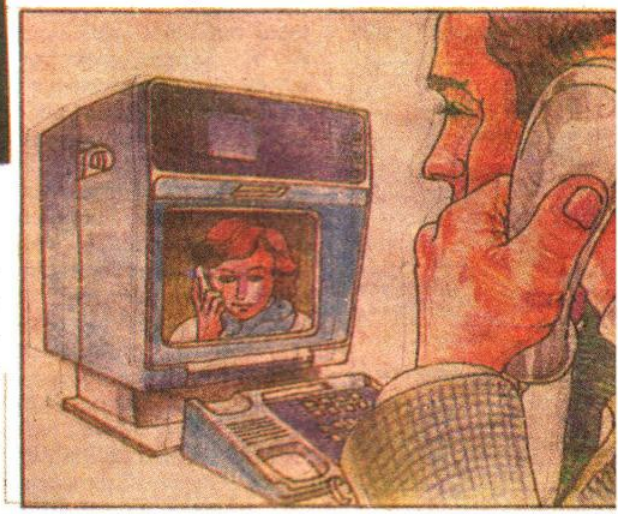

সম্মান পুরস্কার

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা ও কৃতিত্বের জন্য ১৯৯২ সালে সফল বিজ্ঞানীদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স আকাদেমী পদক এবং পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। প্রাপকদের হাতে সম্মান ও পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসীমা রাও। সম্মানিতদের মধ্যে অন্যতম হলেন খড়্গপুর আই আই টির অধ্যাপক কাঠুরীলাল চোপরা, ডঃ জি এ. রবিশঙ্কর, অধ্যাপক শিবরামকৃষ্ণ চন্দ্রশেখর।

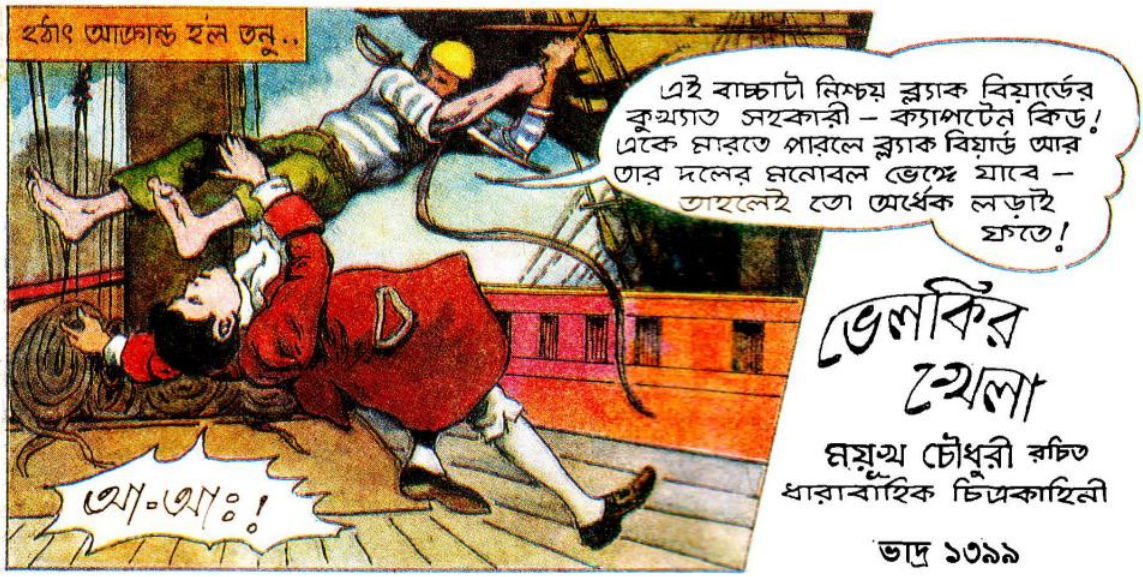
হঠাৎ আক্রান্ত হ'ল তনু..
এই বাচ্চাটা নিশ্চয় ব্ল্যাক বিয়ার্ডের কুখ্যাত সহকারী – ক্যাপটেন কিড! একে মারতে পারলে ব্ল্যাক বিয়ার্ড আর তার দলের মনোবল ভেঙ্গে যাবে – তাহলেই তো অর্ধেক লড়াই ফতে!
ভেলকির খেলা
ময়ূখ চৌধুরী রচিত
ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী
ভাদ্র ১৩৯৯
আ-আঃ!

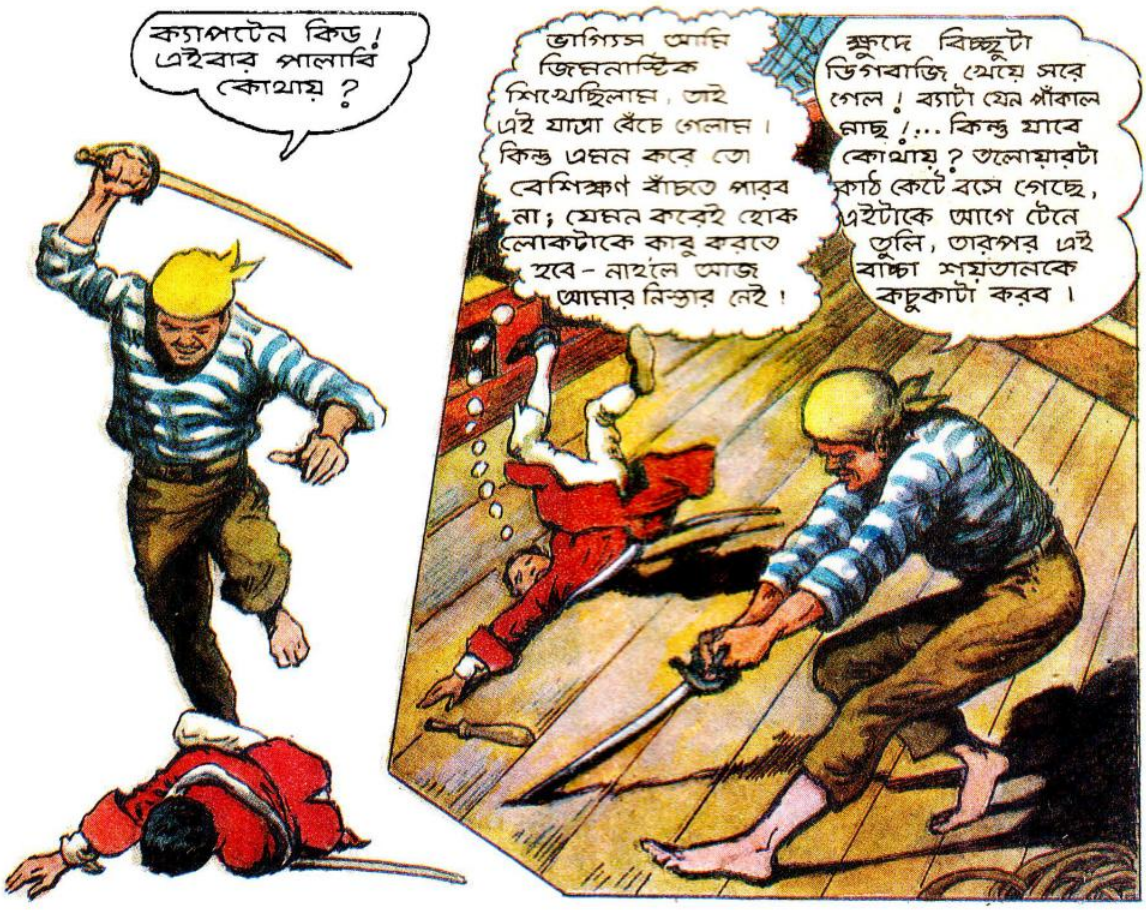
ক্যাপটেন কিড! এইবার পালাবি কোথায়?
ভাগ্যিস আমি জিমনাস্টিক শিখেছিলাম, তাই এই যাত্রা বেঁচে গেলাম। কিন্তু এমন করে তো বেশিক্ষণ বাঁচতে পারব না; যেমন করেই হোক লোকটাকে কাবু করতে হবে – নাহলে আজ আমার নিস্তার নেই!
ক্ষুদে বিচ্ছুটা ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল! ব্যাটা যেন পাঁকাল মাছ!... কিন্তু যাবে কোথায়? তলোয়ারটা কাঠ কেটে বসে গেছে, এইটাকে আগে টেনে তুলি, তারপর এই বাচ্চা শয়তানকে কচুকাটা করব।

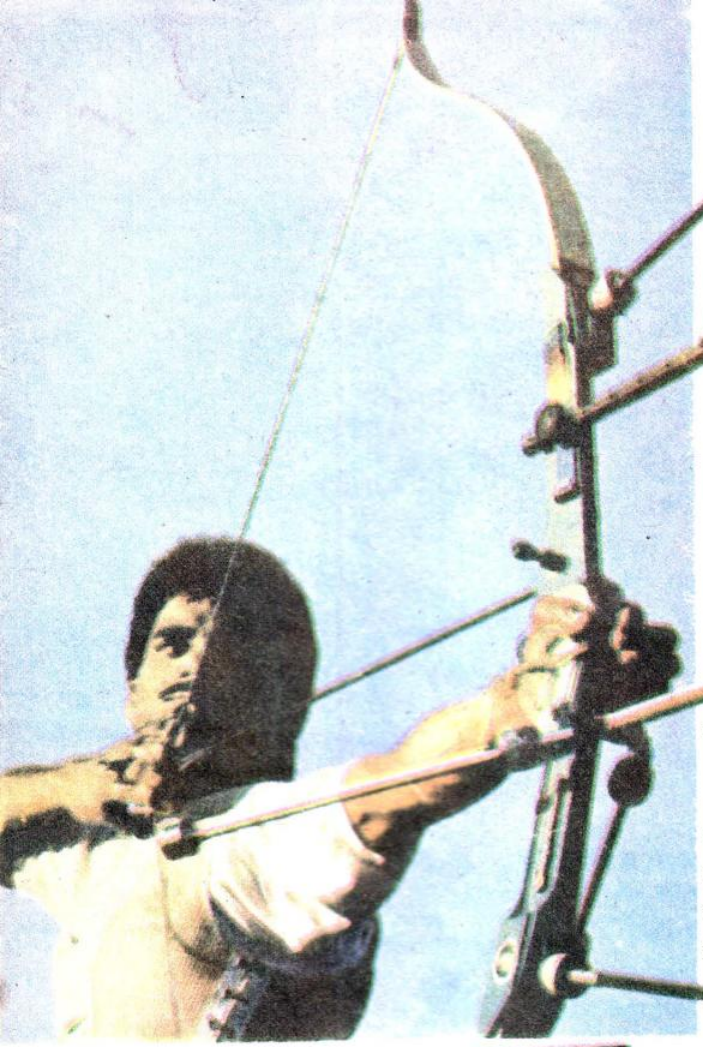

রাজস্থানের গন্ড গ্রাম থেকে বার্সিলোনায়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানের একটি গন্ডগ্রাম। বাস মাত্র কয়েক ঘর মানুষের। তাদের কাজ শুধু চাষবাস। যাদের জমিজমা আছে তারাও কাজ করে, যাদের নেই তারা অন্যের জমিতে খাটে। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার বেশি আর কিছু করার সামর্থ্য ওদের নেই। শুকনো কাঠ যোগাড় করে রান্না করে। গরমের সময় দূর দূর জায়গায় মেয়েদের যেতে হয় জলের জন্যে। বড়রা ক্ষেতে কাজ করে, মেয়েরা বাড়ির।

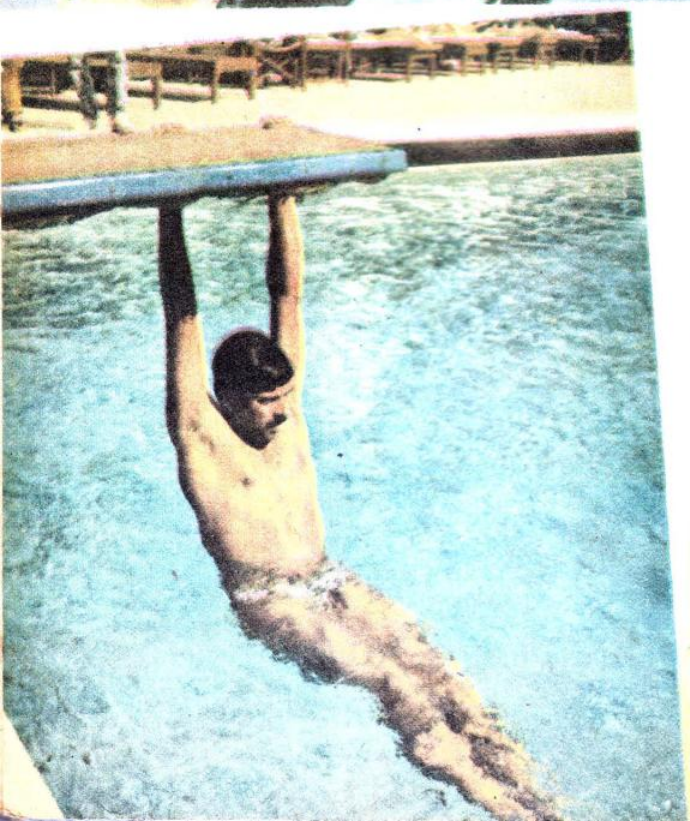

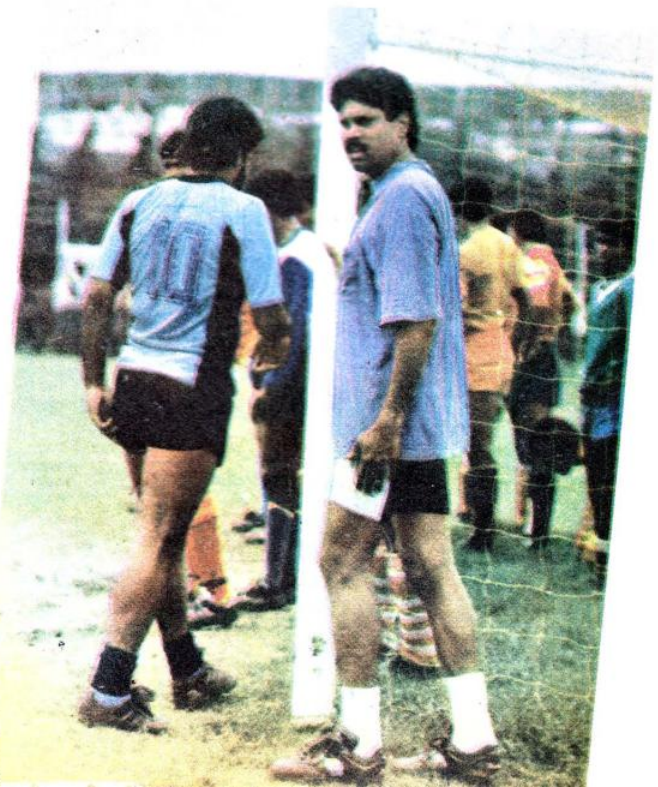

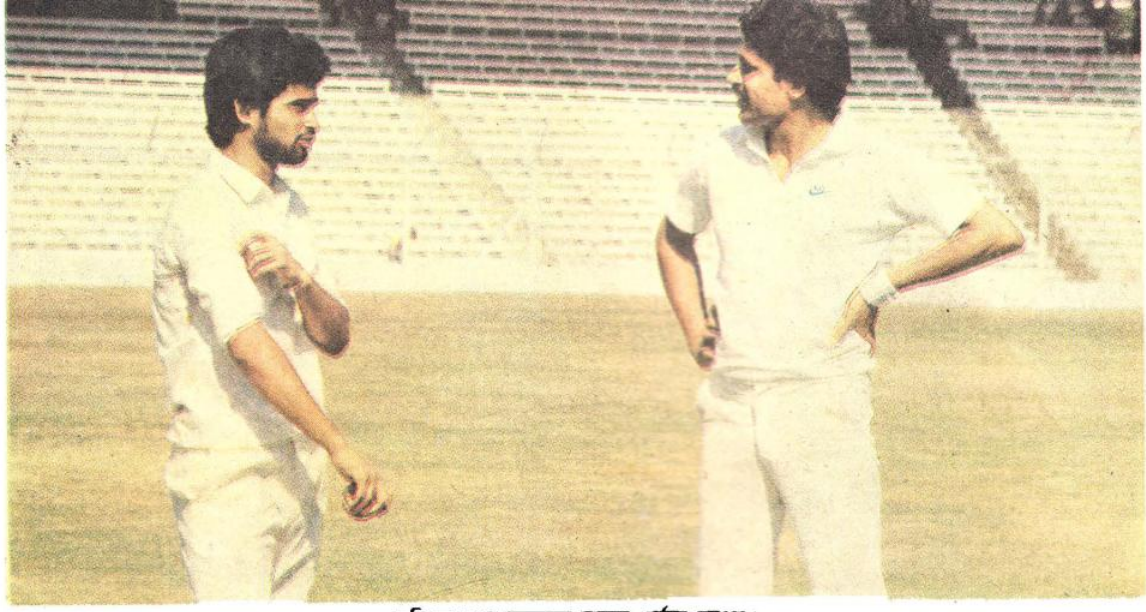

কপিল কথা বলছেন চেতন শর্মার সঙ্গে।

অবসর পেলে তারাও নেমে পড়ে ক্ষেতে। আর ছোটরা খেলে বেড়ায়। কতো রকম যে খেলা! তার মধ্যে আছে তীর ছোঁড়াও। তীর ছুঁড়ে পাখি মারা ছিলো ওদের প্রিয় খেলা। হবেই তো! আসলে ওরা যে আদিবাসী। রাজস্থানের আদিবাসী। লেখাপড়ার ধার ধারে না ওরা। সে সামর্থ্য কিংবা ইচ্ছে কোনোটাই ওদের নেই। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শুধু খেলা আর খেলা। তা কাজকর্মও একটু-আধটু করতে হয়। মা, দিদিদের সঙ্গে জল বয়ে আনতে হয়, বাবা কাকাকে ক্ষেতের কাজে সাহায্য করতে হয়। সন্ধের পর অন্ধকার নামলেই ওরা ঢুকে পড়ে ওদের ঝুপড়ি ঘরে। কারো ঝুপড়িতে টিম টিম করে আলো জ্বলে, কারো জ্বলে না। অতি সরল ওদের জীবনযাত্রা। কেউ ওদের খবর রাখে না। কিন্তু ওরা আছে। দিব্যি আছে।

সেবার ঐ অধিবাসী গ্রামটার কাছে বিশেষ গ্রামীন ক্রীড়ার আসর বসেছে। সেই প্রতিযোগিতায় কেউ ছুটছে, কেউ লাফাচ্ছে, কেউ আবার তীর ছুঁড়ছে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেরাও সেই খেলকুদ দেখতে এসেছিলো। তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে একটি আদিবাসী ছেলেরও ইচ্ছে হলো তীর ছোঁড়ার। কথাটা বলতেই তার বাবা-দাদারা হাঁ হাঁ করে উঠলো। ছেলেটা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে। তা না হলে ঐ সব বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে চায়! তবে হ্যাঁ,তীর ছোঁড়ার ব্যাপারে ও ওদের সকলকে টেক্কা দিতে পারে। তাই বলে মাঠে নেমে বাবু, মহাজনদের ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীর ছুঁড়বে! তাহলে আর দেখতে হবে না।

কিন্তু পনেরো বছরের ছেলেটাকে রোখা গেলো না। সে একরকম জোর করে মাঠে নেমে নাম দিয়ে বসলো। ওরা তো আর জানে না ঐ স্পোর্টসের কর্তাদের বেশি নজর ছিলো আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের ওপর। তাই ছেলেটার নাম দিতে কোনো অসুবিধে হলো না। ওকে মাঠে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখে এগিয়ে এলেন একজন কর্মকর্তা। জিজ্ঞেস করলেন কি চাই তোমার? ওদের সঙ্গে দৌড়বে?

না, আমি তীর ছুঁড়বো!

ঠিক আছে তাই ছুঁড়ো। তা তোমার নাম কি?

লিম্বা। লিম্বারাম।

ঠিক আছে। তোমার নাম ডাকলেই তুমি তীর-ধনুক নিয়ে গিয়ে তীর ছুঁড়বে। কেমন?

মাথা নাড়লো পনেরো বছরের আদিবাসী ছেলেটি।

ভদ্রলোক বললেন,এখন যাও তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হয়ে থেকো নাম ডাকলেই চলে আসবে।

বিজয় গর্বে গাঁয়ের সকলের কাছে ফিরে এলো লিম্বা। বাবুরা কি বললো জিজ্ঞেস করতেই লিম্বা বললো, তীর ধনুক তৈরি রাখতে বলেছে। নাম ডাকলেই গিয়ে তীর ছুঁড়তে হবে। কটা ছেলে ছুটে বাড়ি চলে গেলো। নিয়ে এলো তীর আর ধনুক গাছের ডাল কেটে দড়ি বেঁধে তৈরি করা ধনুক। তীরও তাই

আর তাই নিয়েই লিম্বা চমকে দিলো সকলকে। কেউ পেরে উঠলো না ওর সঙ্গে। লক্ষ্যভেদে, ও যেন একলব্য।

রমেশ মাট্টা দিল্লি থেকে রাজস্থানের ঐ বিশেষ গ্রামীন ক্রীড়ায় পর্যবেক্ষক হিসেবে গিয়েছিলেন। তিনি চাইছিলেন কাউকে খুঁজে বের করতে। লিম্বারামের তীর ছোঁড়া দেখে তিনি বুঝলেন, তাঁর রাজস্থানে আসা সার্থক হয়েছে। এই ছেলেটিকে শেখাতে পারলে ও নির্ঘাৎ একদিন দুর্দান্ত তীরন্দাজ হয়ে উঠবে। দেরি করলেন না রমেশ মাট্টা। লিম্বার বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলে তাকে নিয়ে এলেন দিল্লীতে। সাই অর্থাৎ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় নাম লেখালো পনেরো বছরের আদিবাসী তরুণ লিম্বারাম। বেশিদিনের নয় এ মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। সুন্দর দাসের কাছে শুরু হলো লিম্বার প্রশিক্ষণ। এরপর লিম্বারামের দায়িত্ব তুলে নিলেন রুশ কোচ নিকোলায়েভ।

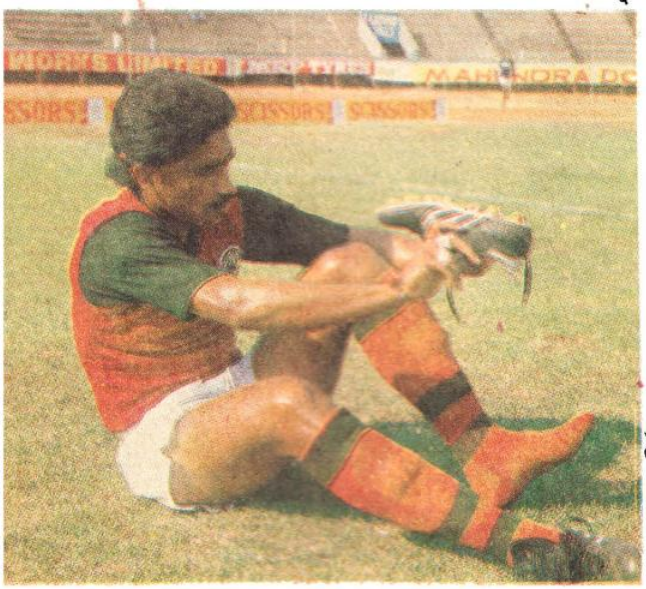

প্রশান্ত ব্যানার্জি

বাস, পাঁচ বছরের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেলো রাজস্থানের আদিবাসী ছেলেটি। আগে হয়েছিলো ভারত চ্যাম্পিয়ন আর এবার হয়েছে এশিয়ার সেরা। শুধু তাই নয়, মাস তিনেক আগে পিকিংয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ফেলে হৈচৈ বাধিয়ে দিয়েছে লিম্বা। সকলেই তাই ধরে নিয়েছেন এবারের বার্সিলোনা ওলিম্পিকে লিম্বারাম হয়তো দারুণ একটা কিছু করে ফেলবে। কারণ পিকিং-এ লিম্বারাম ৩৬০ এর ভেতর পেয়েছিলো ৩৫৭ পয়েন্ট। দুর্দান্ত পারফরমেন্স। লিম্বারাম যদি এই কৃতিত্ব ধরে রাখতে পারে তাহলে বার্সিলোনা থেকে পদক গলায় ঝুলিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। কলকাতায় লিম্বারাম যখন তৈরি হচ্ছিলো ওলিম্পিকের জন্যে তখন একদিন কথায় কথায় পদকের বিষয় জিজ্ঞেস করতেই লিম্বারাম বলেছিলো, এ সবই ওপরওয়ালার কৃপা। ওঁর ইচ্ছে হলে পদক পাবো, রেকর্ড গড়বো। না হলে কিছু হবে না।

তা লিম্বারাম যাই বলুক না কেন, ওর দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে আছি। ব্যক্তিগত বিভাগে ভারতকে একটি পদক এনে দেবার সম্ভাবনা ওরই সব থেকে বেশি। এই লেখা ছাপা হতে হতে বার্সিলোনা ওলিম্পিক অনেকটাই এগিয়ে যাবে। লিম্বারামের কথামতো উপরওয়ালার আশীর্বাদ থাকলে তিনিও হয়তো পৌঁছে যাবেন পদকের কাছাকাছি।

লিম্বারাম যদি পদক পান তাহলে সাইএর একটা পরীক্ষা সফল হবে। সাইএর দু একজন কর্তা গোড়া থেকেই ভারতের আদিবাসী ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিতে বলেছিলেন, তাদের আরো বেশি করে সুযোগ দিতে বলেছিলেন। তাঁদের কথার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। তবে লিম্বার আগেও বেশ কয়েকজন আদিবাসী ছেলেমেয়ে নজর কেড়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনো ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সে যাই হোক এবারের ওলিম্পিকে লিম্বারাম ছাড়া ভারতের পদক পাবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি হকিতে। ভারতের হকি অধিনায়ক গুরুবক্স সিং বলেছেন, সেমিফাইনালে উঠতে পারলে ভারতের এবার সোনা না জেতার কারণ নেই। ওলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসেবে ভারত বিভিন্ন দেশে খেলতে গিয়ে দুর্দান্ত খেলে এসেছে। হল্যান্ড, ইংলন্ড প্রভৃতি দলকে হেলায় হারিয়েছে। গুরবক্স সিং-এর মতে, এইরকম সেট দল ভারত অনেকদিন পায়নি। তাই ওলিম্পিকের সোনা এবার আর সোনার হরিণ নয়। অনেকটাই নাগালের মধ্যে আছে। তবে প্রাথমিক পর্বের খেলাগুলো ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গণ্ডিটা ডিঙিয়ে যেতে পারলে মনে হয় ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ভারতও পৌঁছে যাবে পদকের খুব কাছাকাছি।

আমরাও সেই আশাতেই থাকবো। হকি ছাড়া নৌ চালনা, কুস্তির দিকটাতেও নজর রাখতে হবে। এই দুটি বিভাগেও ভারতীয় প্রতিযোগীরা পদকের খুব কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবেন বলেই মনে হয় তবে পদকের শিকে ছিঁড়বে কিনা কে জানে! ব্যাডমিন্টন আর টেনিসেও ভারতীয়দের পদক না পেলেও ভালো খেলার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কোনোভাবে পদক যদি জুটে যায় সে তো শুধু বাড়তি লাভই নয়–বিরাট ব্যাপারও বটে। আমাদের শুধু একটাই চাহিদা, বার্সিলোনা ওলিম্পিক থেকে ভারতীয়রা যেন শূন্য হাতে ফিরে না আসেন। এতো বড়ো আমাদের এই দেশ–আমরা কি একটা সোনার স্বপ্ন দেখতে পারি না?

এবারের ওলিম্পিকে অনেক বিশ্বশ্রেষ্ঠ অ্যাথলিটের বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠবে। কার্ল লিউইস জ্যাকি জয়নার কার্সি, এড্রুইন মোজেস, ডালি টমসনদের আর হয়তো দেখতে পাবো না। চার বছর আগে সিওল ওলিম্পিকে কার্ল লিউইস আর বেন জনসনের দৌড় নিয়ে সারা বিশ্ব মেতে উঠেছিলো। শেষ পর্যন্ত শত মিটারের সেই দৌড়ে জিতেছিলেন কানাডার বেন জনসন। কিন্তু ড্রাগ নেবার অপরাধে তিনি বাতিল হয়ে যান। তাঁর কাছ থেকে সোনার মেডেল কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কার্ল লিউইসকে। সেই লিউইস কিন্তু এবার শতমিটার দৌড়ে মার্কিন দলে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় ষষ্ঠ স্থান পেয়ে সকলকে হতাশ করেছেন। কার্ল-এর এই ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে ওঁদের যুগ শেষ, বার্সিলোনায় এবার উঠে আসবেন আর একদল নতুন অ্যাথলিট। পরবর্তী যুগে শিরোনামে থাকবেন তাঁরাই। তাই কারো বিদায়, কারো আগমন–এই নিয়ে হাসি কান্নায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে বার্সিলোনা ওলিম্পিক।

গল্প নয় সত্যি

১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকসে সেদিন মেয়েদের ৩০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা হবে। মেয়েদের তিন হাজার মিটার দৌড় সেবারই প্রথম হচ্ছে। দূরপাল্লার দৌড়ে তখন দারুণ নাম আমেরিকার মেরি ডেকার আর বৃটেনের জোলা বাড। সকলেই ধরে নিয়েছিলেন এঁদের দুজনের মধ্যে একজন সোনা অন্যজন রুপো জিতবেন। কিন্তু সোনা জিতবেন কে–মেরি না জোলা? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে লস অ্যাঞ্জেলেসে সেদিন দারুণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা। সারা বিশ্বও সেদিন তাকিয়েছিলো ঐ দুই প্রতিযোগিনীর দিকে।

দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শুরু হলো তিন হাজার মিটার দৌড়। মেরি ডেকার আর জোলা বাড দৌড়চ্ছেন এক তালে পাল্লা দিয়ে। দুজনেই পাশাপাশি, প্রায় গায় গা লাগিয়ে ছুটছেন। প্রায় ১৭০০ মিটার পর্যন্ত দুজন পাশাপাশি ছুটলেন। আর তারপরই জোলা হঠাৎ মেরিকে পেছনে ফেলে সামান্য এগিয়ে গেলেন। মেরিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। মেরি ছিলেন ভেতরের দিকের লেনে। তাঁর বাঁ পাশের লেনে জোলা। মেরি ডেকার জোরে ছুটে অতিক্রম করতে গেলেন জোলাকে। হঠাৎ মেরির পা গিয়ে লাগলো জোলার পায়। জোলা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার দৌড়তে লাগলেন। কিন্তু পাঁচ পা যেতে না যেতে মেরির রানিং শুর স্টাড গিয়ে লাগলো জোলার ডান পার গোড়ালিতে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলো জোলার গোড়ালি। দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। জোলার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো আর্ত আর্তনাদ। কিন্তু সেই রক্তঝরা পা নিয়ে জোলা ছুটছেন। পারছেন না–তবু নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কোনোরকমে। তাঁর গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে উঠেছে। ওদিকে মেরি কিন্তু জোলার পা ক্ষত-বিক্ষত করে দেবার পর গড়িয়ে পড়েছেন ট্রাকে। তাঁর পায় খুব লেগেছে। ওঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারলেন না। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন জোলা এগিয়ে যাচ্ছেন। আস্তে হলেও ছুটছেন তিনি। আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না মেরি। কোনোরকমে উঠে গিয়ে জোলার চুলের মুঠি ধরার চেষ্টা করলেন। মেরি নিজে যখন পদক জিততে পারছেন না তখন জোলাকেও জিততে দেবেন না। কিন্তু পারলেন না জোলার চুলের মুঠি ধরে টেনে ধরতে। তাঁর হাত গিয়ে পড়লো জোলার পিঠের নম্বরের ওপর। টেনে ছিঁড়ে নিলেন নম্বরটা।

ওদিকে জোলার ছোটার গতি আরো কমে গেছে। তবু তিনি এগিয়ে চলেছেন। পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। অন্য প্রতিযোগিনীরা ছিলেন জোলা আর মেরির অনেক পেছনে। তাঁরা এক এক করে জোলাকে টপকে গেলেন। জোলা যখন তিন হাজার মিটারের শেষ সীমায় পৌঁছুলেন তখন আর তিনি পদক পাওয়ার কাছাকাছি নেই। তাঁর আগে ছজন পৌঁছে গেছেন সেখানে। জোলা পেলেন সপ্তম স্থান। কিন্তু তাঁর সান্ত্বনা একটাই। তিনি শেষ সীমায় পৌঁছুতে পেরেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মেরি ডেকার তা পারেননি। এই বিভাগে প্রথম হলেন রোমানিয়ার পুইকা। তাঁর সময় লেগেছিলো ৮ মিনিট ৩৫.৯৬ সেকেন্ড।

প্রতিযোগিতার পর মেরি ডেকার আর জোলা বাডের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো। একে অন্যকে দোষ দিতে লাগলেন। কাগজে কাগজে তাই নিয়ে ফলাও করে লেখা হতে লাগলো। দুজনের কথা বন্ধ, এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

ওলিম্পিকে ভারত

আমাদের এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকে আমরা কোনোদিনই তেমন সুবিধে করতে পারিনি। হকিতে এ পর্যন্ত আটবার সোনা পাওয়া ছাড়া আর কখনো সোনার মুখ দেখতে পাইনি। ওলিম্পিকে ভারত এ পর্যন্ত মোট ১৪টি পদক পেয়েছে। তার মধ্যে আছে ৮টি সোনা ৩টি রুপো আর ৩টি ব্রোঞ্জ পদক।

হকির ৮টি সোনা ছাড়া কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে নর্মান পিচার্ডের দুটি রুপো জেতা উল্লেখযোগ্য। পিচার্ড ২০০ মিটার দৌড় আর ২০০ মিটার হার্ডলসে রুপো পেয়েছিলেন।

ওলিম্পিক কবে কোথায়

প্রথম ওলিম্পিক	১৮৯৬ সালে এথেন্সে
দ্বিতীয় ওলিম্পিক	১৯০০ সালে প্যারিসে
তৃতীয় ওলিম্পিক	১৯০৪ সালে সেন্ট লুইএ
চতুর্থ ওলিম্পিক	১৯০৮ সালে লন্ডনে
পঞ্চম ওলিম্পিক	১৯১২ সালে স্টকহোমে
ষষ্ঠ ওলিম্পিক	১৯১৬ সালে বার্লিনে
সপ্তম ওলিম্পিক	১৯২০ সালে এন্টোয়ার্পে
অষ্টম ওলিম্পিক	১৯২৪ সালে প্যারিসে
নবম ওলিম্পিক	১৯২৮ সালে আমস্টারডামে
দশম ওলিম্পিক	১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে
একাদশ ওলিম্পিক	১৯৩৬ সালে বার্লিনে
দ্বাদশ ওলিম্পিক	১৯৪০ সালে টোকিও এবং পরে হেলসিঙ্কিতে *
ত্রয়োদশ ওলিম্পিক	১৯৪৪ সালে লন্ডনে *
চতুর্দশ ওলিম্পিক	১৯৪৮ সালে লন্ডনে
পঞ্চদশ ওলিম্পিক	১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে
ষোড়শ ওলিম্পিক	১৯৫৬ সালে মেলবোর্নে
সপ্তদশ ওলিম্পিক	১৯৬০ সালে রোমে
অষ্টাদশ ওলিম্পিক	১৯৬৪ সালে টোকিওতে
উনবিংশ ওলিম্পিক	১৯৬৮ সালে মেক্সিকো সিটি
বিংশতি ওলিম্পিক	১৯৭২ সালে মিউনিখে
একবিংশ ওলিম্পিক	১৯৭৬ সালে মন্ট্রিয়েলে
দ্বাবিংশ ওলিম্পিক	১৯৮০ সালে মস্কোতে
ত্রয়োবিংশ ওলিম্পিক	১৯৮৪ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসে

চতুর্বিংশ ওলিম্পিক ১৯৮৮ সালে সিওলে
পঞ্চবিংশ ওলিম্পিক ১৯৯২ সালে বার্সিলোনায়
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পরিত্যক্ত।
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য পরিত্যক্ত।

খবর-টবর

ব্যর্থ স্বপ্ন

মার্ক স্পিৎজের নাম মনে আছে তো? সেই যে আমেরিকার ডাকসাইটে সাঁতারু–১৯৭২ সালের ওলিম্পিকে জল তোলপাড় করে সাত সাতটি সোনার মেডেল জিতেছিলেন–তিনি চেয়েছিলেন এবারের অর্থাৎ বার্সিলোনা ওলিম্পিকে সাঁতারের পুলে নিজের দক্ষতার প্রমাণ আর একবার দিতে। স্পিৎজের বয়েস এখন ৪২। গত বছর হঠাৎই তিনি সকলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সংকল্পের কথা। কিন্তু এই বয়সে কি ওলিম্পিকের মতো দারুণ একটা প্রতিযোগিতায় কিছু করা সম্ভব? কিন্তু মানুষটি যে মার্ক স্পিৎজ। তাই অবিশ্বাসের রেখা চোখে মুখে খেলে গেলেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেননি উল্টে তাঁরা দেখতে চাইছিলেন, বয়েসটা যে কোনো বাধাই নয় এই সত্যটা আরো একবার প্রমাণ করে দিতে পারেন কিনা! না, তা পারলেন না স্পিৎজ। আমেরিকার ওলিম্পিক দল গড়ার সুইমিং ট্রায়াল থেকেই তাঁকে বিদায় নিতে হলো। কুড়ি বছর আগে যিনি সাতটি বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছিলেন তাঁকেই এবার শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিলো সুইমিং পুলই। আর কারো কাছে নয়–মার্ক স্পিৎজকে হার মানতে হলো তাঁর নিজের বয়েসের কাছে।

জেনে রাখো

ওলিম্পিক হকিতে একটি খেলায় সব থেকে বেশি গোল করার কৃতিত্ব ভারতের রূপ সিং-এর। ১৯৩২ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস ওলিম্পিকে ভারত আমেরিকাকে ২৪-০ গোলে হারিয়েছিলো। সেই খেলায় রূপ সিং একাই দশটি গোল দিয়েছিলেন।

●●●

হেক্টর রডরিগ বলে একটি বাচ্চা ছেলেকে ধরে বেদম পেটাতো তার দাদারা। মার খেতে খেতে হেক্টর তিতিবিরক্ত হয়ে দাদাদের ঠান্ডা করে দেবার জন্যে জুডো শিখতে শুরু করলো। ভেবেছিলো, জুডোটা শিখে নিলেই দাদাদের মারের হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে। জুডো শিখে হেক্টর শুধু দাদাদেরই টাইট করেনি ১৯৭৬ সালের মন্ট্রিয়েল ওলিম্পিকে সোনার পদকও পেয়ে গিয়েছিলো। কিউবার হেক্টর রডরিগ জুডোর লাইট ওয়েট বিভাগে ওলিম্পিকের সোনা জিতেছিলো।

●●●

ম্যারাথন ও দূরপাল্লার দৌড়ে চারটি সোনা একটি রুপো জেতা চেকোশ্লোভাকিয়ায় এমিল জ্যাটোপেক বিয়ে করেছিলেন ১৯৫২ সালে ওলিম্পিকে বর্শা ছুঁড়ে সোনার পদক পাওয়া ডানাকে। এই অ্যাথলিট দম্পতির বয়স কিন্তু একদম এক কেউ কারো চেয়ে একদিনেরও ছোট বড় নয়। দুজনেরই জন্ম ১৯২২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর।

উক্তি

আমি লিখলাম, বই বেরুলো, অভিনয় করলাম কিন্তু কোর্টের মায়া কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না। তাই আবার ফিরে এসেছি কোর্টে। দেখি বার্সিলোনায় কি করতে পারি।

–জ্যাকি জয়নার

(নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সিওলের রানী বলেছেন এই কথা)

ভাবতে পারছি না আমার ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে শেষ চেষ্টা আমি একবার করবোই। নিশ্চয়ই পারবো জ্বলে উঠতে।

–কার্ল লিউইস

(নিজের ব্যর্থতা আর বার্সিলোনা ওলিম্পিকে তাঁর পদক জেতার সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে)

অনেকদিন পরে এবার আবার ভারতের হকিতে সোনা জেতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সোনা না জিতলেও একটা পদক মনে হয় ভারত পাবেই।

–গুরবক্স সিং

(বার্সিলোনা ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

আমি কোনোদিন রেকর্ড বা পদক নিয়ে ভাবি না। আমি বিশ্বাস করি উপরওয়ালার যা মর্জি তাই হবে।

–লিম্বারাম

(বার্সিলোনায় পদক পাবেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে)

আর আমার দৌড়বার ইচ্ছে নেই।

–এড্‌উইন মোজেস

(নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে)

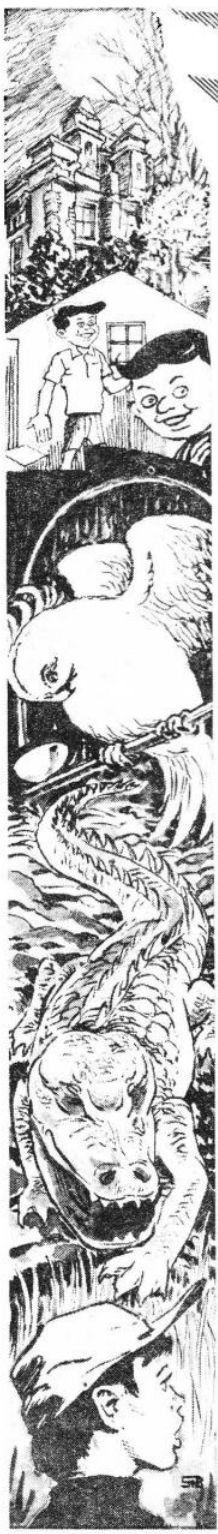

পুজো আসছে, তার অনেক আগেই হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়বে

শারদীয়া

☆☆☆☆☆★★ শুকতারা ★★☆☆☆☆☆

১৩৯৯

ছোট বড় সবার প্রিয়, বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
ছোটদের মাসিক পত্রিকা

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া আর কমিকসে ঠাসা বিশাল আকারের এই সংখ্যাটি দামে যেমন কম, লেখায় তেমনি সেরা। অন্যবারের মতো এবারও শারদীয়া শুকতারা সকলকে চমকে দেবেই।

পি· সি· সরকার জুনিয়রের কমিকসে ম্যাজিক, নারায়ণ দেবনাথের বাঁটুল, হাঁদা-ভোঁদার সম্পূর্ণ কাহিনী আর বাহাদুর বেড়াল। সুফির নতুন কমিকস এবং আরো অনেক কিছু।

খেলা নিয়ে নামকরা সব খেলোয়াড়দের লেখার পাশাপাশি থাকবে ফ্রান্সিসের নতুন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী।

এ ছাড়া সম্পূর্ণ উপন্যাস, ছোট বড় নানা স্বাদের গল্প, মজার মজার লেখা, রঙিন ফিচার, আরো কতো কী যে আছে! লিখছেন ঃ

আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, নবনীতা দেবসেন, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মজুমদার, মঞ্জিল সেন, নলিনী দাশ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, প্রণবেশ চক্রবর্তী, ডাঃ বিশ্বনাথ রায়, অগ্নিমিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, সলিল লাহিড়ী, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, অজেয় রায়, অনিল ভৌমিক, পরেশ ভট্টাচার্য, রেবন্ত গোস্বামী, ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, গৌরী দে, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবল দেববর্মা, নটরাজন, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

কবিতা ও ছড়া—অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, সুনীল বসু, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, মায়া বসু, কালিদাস ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকের কলমে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ক্লাব-পরিচিত

রিয়েল মাদ্রিদঃ পুসকাসের ক্লাব

সুমন ভট্টাচার্য

রিয়েল মাদ্রিদ নামটি শোনামাত্র বিশ্বের আপামর ক্রীড়ামোদীদের মনে পড়ে যায় ১৯৫৬-৬০ টানা ৫ বছর এই ক্লাবের ইউরোপীয়ান কাপ জয়ের রেকর্ড। ইউরোপের ফুটবল ইতিহাসে এই অনবদ্য কৃতিত্ব অন্য আর কোনো দেশের কোনো ক্লাবের নেই। সেই কারণে রিয়েল মাদ্রিদ ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের ফুটবলে একটি বিশেষ নাম।

সত্যি কথা বলতে কী, রিয়েল মাদ্রিদ শুধুমাত্র স্পেনের একটি ক্লাব মাত্র নয়, এটা একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান। ক্লাবে শুধু ফুটবলই খেলা হয় না, তার সঙ্গে খেলা হয় লন টেনিস, হকি ও বাস্কেটবল। সাইক্লিং, সাঁতার এবং অন্যান্য খেলাধূলারও সুবন্দোবস্ত আছে। তাই একে স্পেনে বলা হয় পরিবারের সকলের উপযুক্ত একটি মনোরঞ্জনের প্রতিষ্ঠান।

*এই ক্লাবের ইতিহাসও যেমন পুরনো তেমনি গৌরবময়। ১৯২৮ সালে স্প্যানিশ লীগের সূচনা হয়। কিন্তু তারও ১৩ বছর আগে রিয়েল মাদ্রিদ স্পেনের ফুটবল জগতে ঝড় তুলেছিল টানা চার বার (১৯০৫-১৯০৮) স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে। এখনো অবধি তারা ৩০ বারেরও বেশি স্প্যানিশ লীগ ও ২০ বারেরও বেশি স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিয়েছে।

তবে আগেই বলেছি রিয়েল মাদ্রিদ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে ১৯৫০-এর দশকে। এই সময়ই একদিকে ইউরোপীয় ফুটবলের সেরা দল বাছতে শুরু হয় ইউরোপীয়ান কাপ প্রতিযোগিতা। আর অপরদিকে রিয়েল মাদ্রিদের পেছনে এসে দাঁড়ান ধনকুবের স্যান্টিয়োগো বার্নাবিউ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রিয়েল মাদ্রিদ গড়ে তোলে তাদের নিজস্ব নতুন স্টেডিয়াম, তৈরি করে নিজেদের দুরন্ত ফুটবল দল। এই ফুটবল দলের মূল স্তম্ভ ছিলেন আর্জেন্টিনীয় তারকা আলফ্রেড ডি স্টেফানো। লাতিন আমেরিকা ঘরানার এই দুরন্ত খেলোয়াড়কে নিয়ে প্রথমে রিয়েল মাদ্রিদের সঙ্গে স্পেনের আরেক জনপ্রিয় ক্লাব বার্সিলোনার প্রবল রেষারেষি ছিল, কিন্তু তখন স্টেফানো কিছুদিন অফফর্মে থাকায় বার্সিলোনা সরে আসে এবং মাদ্রিদ স্টেফানোকে পায়। স্টেফানো প্রতিশোধ নেন প্রথম খেলাতেই বার্সিলোনাকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করে। এর মধ্যে স্টেফানো একাই চারটি গোল করেন। অনেকেই মনে করেন এরপর মূলতঃ স্টেফানোর একার কাঁধে ভর দিয়ে মাদ্রিদ তার ইউরোপ বিজয় শুরু করে।

১৯৫৪-তে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবার পর ১৯৫৬-৬০ টানা ৫ বার রিয়েল মাদ্রিদ ইউরোপীয়ান কাপ জেতে। প্রথমবার তারা প্যারিসেই ফ্রান্সের রেইমকে হারায় ৪-৩ (১৯৫৬) গোলে। পরের বার ইতালীর বিওরেন্তিনাকে ২-০ (১৯৫৭) গোলে, নিজেদের শহর মাদ্রিদে। তার পরের বার ব্রাসলসে অতিরিক্ত সময়ে হারায় ইতালীর এ. সি. মিলানকে ৩-২ গোলে (১৯৫৮)। ১৯৫৯-এ আবার স্টুটগার্টে রেইমকেই পরাস্ত করে ২-০ গোলে। ১৯৬০-এ গ্লাসগোতে পশ্চিম জার্মানির এইনট্রাকি ফ্রাঙ্কফুর্টকে গুঁড়িয়ে দেয় ৭-৩ গোলে। ১৯৬০-এ রিয়েল মাদ্রিদ সে বছরই শুরু হওয়া বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপও জেতে উরুগুয়ের পেনারলকে হারিয়ে, প্রথম খেলা গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয় খেলায় পেনারল ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে যায় ১-৫ গোলে পরাস্ত হয়ে। এই সময় রিয়েল মাদ্রিদে ছিলেন ইউরোপের বহু বিখ্যাত ফুটবলার, হাঙ্গেরীর ফেরেঙ্ক পুসকাস, ফ্রান্সের রেমন্ড কোপা, যিনি ১৯৫৮ সালে ইউরোপীয়ান ফুটবলার-অফ দি ইয়ারও হন। স্টেফানোও অবশ্য দুবার (১৯৫৭ ও ১৯৫৯) ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দি ইয়ার হন মাদ্রিদের অন্যান্য তারকা খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন জোসে মারিয়ে জারওসো, ফ্রান্সিস কে জেন্টো এবং গোলকীপার অ্যালেনসো।

এই স্বর্ণযুগের পরে রিয়েল মাদ্রিদ আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আসে ১৯৬২-তে যখন ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনালে ওঠে। কিন্তু আমস্টার্ডামে ফাইনালে বেনেফিকার কাছে ৩-৫ গোলে হেরে যায়। ১৯৬৪-তেও ফাইনালে উঠে তারা পর্যুদস্ত হয় ইতালীর ইন্টারন্যাশনালের কাছে ১-৩ গোলে। ১৯৬৬-তে আবার তারা সাফল্যে ফেরে ব্রাসেলসে যুগোস্লাভিয়ার পার্টিজান বেলগ্রেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইউরোপীয়ান কাপ জিতে কিন্তু সেবার তারা বিশ্বক্লাব কাপের ফাইনালে সেই পেনারলের কাছেই হেরে যায় 0-৪ গোলে। ১৯৮১-তেও তারা ইউরোপীয়ান কাপে রানার্স হয় প্যারিসে লিভারপুলের কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়ে। ১৯৭১ এ এথেন্সে ইংল্যান্ডের চেলসার সঙ্গে ইউরোপীয়ান কাপ উইনার্স কাপের ফাইনালে প্রথমে ১-১ গোলে ড্র করলে পরে মাদ্রিদ পুনরনুষ্ঠিত খেলায় হেরে যায় ১-২ গোলে।

৮০-র দশকে রিয়েল মাদ্রিদের সেরা তারকা ছিলেন মেক্সিকোর স্ট্রাইকার হুগো সানচেজ। মূলতঃ তাঁর কৃতিত্বেই ১৯৮৫ ও ১৯৮৬-তে পরপর দুবার তারা উয়েফা কাপ জেতে। প্রথমবার তারা হাঙ্গেরীর ভিডিওটোনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে কাপ জেতে। দ্বিতীয়বার পশ্চিম জার্মানির কোলোনকে উড়িয়ে দেয় ৫-৩ গোলে।

রিয়েল মাদ্রিদ সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমিকদের কাছে তাই অত্যন্ত পরিচিত শুধু নয়, জনপ্রিয় ক্লাবও বটে।

পড়ার সঙ্গে খেলা

উত্তর চব্বিশ পরগনার সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতন

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বেলেঘাটার শেষ প্রান্ত ছেড়ে যে রাস্তাটি সল্ট-লেক-এর নিক্কো পার্কের দিকে চলে গেছে সেই দিকে সুকান্তনগর। এই অঞ্চলেই অবস্থান সুকান্তনগর বিদ্যানিকেতন-এর। যদিও এর ঠিকানা কলি-৯১, কিন্তু মূলত এটি উত্তর ২৪ পরগনার অংশ।

১৯৮২ সালে জুনিয়র হাই স্কুল (অষ্টম) হিসেবে বিদ্যালয়ের জন্ম। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই অঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। বলা যায় প্রাথমিক সেই উদ্যোগ সফল হয়েছে। কেননা বিদ্যালয় বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বেড়েছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও। আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যাপারে যত্ন নেন। মাধ্যমিকে ফলাফল খুব বেশি ভাল না হলেও হতাশাব্যঞ্জক নয়। প্রধান শিক্ষক শিবেন্দু দাস জানালেন, এই অঞ্চলটি এত বেশি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল যে, বহু ছাত্র-ছাত্রী মাঝপথেই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। ফলে ভাল ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে সাংস্কৃতিক চেতনা বাড়ে সেইজন্য বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয় তাদের। ইতিমধ্যে আবৃত্তি ও বিতর্কে পুরস্কারও লাভ করেছে স্কুল।

বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধূলার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকদের উৎসাহ পেয়ে আসছে। বিশেষ করে কবাডি, ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সে।

কবাডি খেলায় জোনাল প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয় প্রতি বছর নাম দিয়ে থাকে এবং ফলাফলও উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের নিয়মিত খেলোয়াড়রা হলো সুরজিৎ মন্ডল, গোপাল মন্ডল, শঙ্কর হাজরা, অশোক বাড়ুই, প্রফুল্ল মালো, রবীন মন্ডল, তাপসী মন্ডল, রমা নস্কর, মিতালি রায় ও মীনা দাস। এছাড়া স্কুলের একজন ছাত্রী শুভ্রা দাসপাল সাই-এর কবাডিতে সুযোগ পেয়েছে।

বিদ্যালয়ের ফুটবল দলটিও খুব ভালো। নিজস্ব মাঠ থাকায় অনুশীলনের জন্য অন্য কোথাও ছাত্রদের যেতে হয় না। এ যাবৎ স্কুল থেকে প্রতি বছর দমদম জোনাল ও আই এফ এ পরিচালিত বঙ্কিম স্মৃতি কাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আসছে।

গেমস টিচার কৃষ্ণপদ মন্ডল জানালেন যে, অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের স্কুল সুব্রত কাপে অংশ নিতে পারেনি।

বিদ্যালয়ের নিয়মিত ফুটবল দলে রয়েছে প্রতিটি ক্লাসের ছাত্রেরা যেমন মহাদেব দাস, রঘু চাঁদ, সৌমেন রায়, গণেশ মন্ডল, রাজু কাড়া, গোপাল মন্ডল, সুরজিৎ মন্ডল, প্রদীপ দাস, সাধন মন্ডল, বাপি মন্ডল, কার্তিক মালিক ও রাজু বসু। এদের মধ্যে রঘু চাঁদ ও মহাদেব দাস কলকাতায় গড়ের মাঠের চতুর্থ ডিভিশনের নিয়মিত খেলোয়াড়।

এছাড়া অ্যাথলেটিক্সেও স্কুল সুনাম অর্জন করেছে। জোনাল ও সাব ডিভিশনের প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয় প্রতি বছর যোগ দিয়ে থাকে, বিশেষ করে রান, লঙ জাম্প ও থ্রোয়িং ইভেন্টে। উল্লেখযোগ্য অ্যাথলীটরা হলো সাধন মন্ডল, গণেশ মন্ডল, শঙ্কর হাজরা ও পূর্ণিমা হাতি। স্কুলের ছাত্রী মৌসুমী দৌড়ের জন্য সাই-এ সুযোগ পেয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও গেমস টিচার যৌথভাবে আক্ষেপ করে জানালেন যে, আর্থিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের উন্নতি করতে পারলে তাঁদের স্কুল আরও ভালো ফল করতে পারতো।

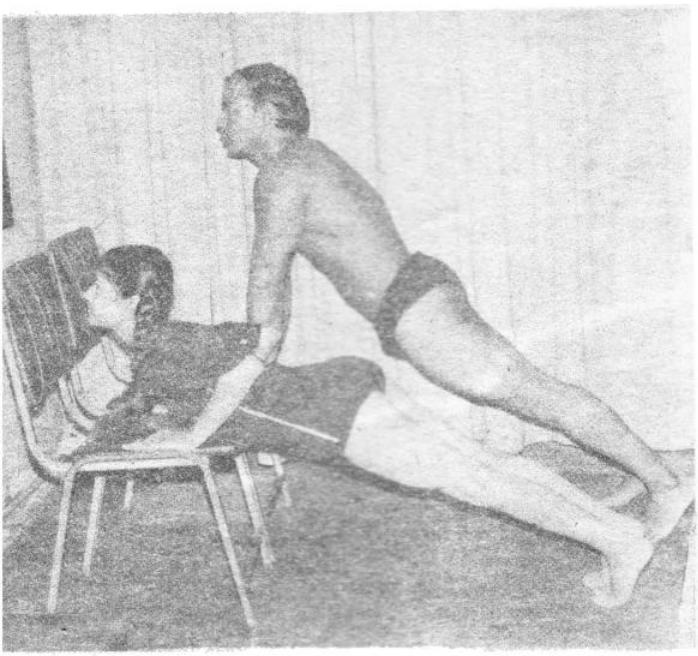

পুশ আপস

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। এই সৌন্দর্য মন, শরীর, কাজকর্ম সব নিয়েই। সুন্দর মন বলতে বোঝায় হিংসা, বিদ্বেষহীন মন। সুন্দর শরীর বলতে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাস্থ্য, যার চামড়াটা চকচকে ও টানটান, চোখ দুটি উজ্জ্বল আর শরীরের মাংসপেশীগুলি ইস্পাতসম অর্থাৎ মেদের আধিক্য নেই কোথাও দৈহিক ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি শরীর। এই সামঞ্জস্য আনতে লাগে কঠিন সাধনা। আর সেই সাধনাই হচ্ছে ব্যায়াম নিয়মিত ব্যায়াম করে আমরা আমাদের মন ও শরীর দুটোকেই করতে পারি সুন্দর। লোভে পড়ে অপ্রয়োজনে চকলেট, ঘি, মাখন বা অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। এর জন্য চাই সংযম। ব্যায়াম করলে এই সংযমও আয়ত্ত করতে পারবে।

এখন আজকের ব্যায়ামে আসি। তোমাদের আমি কারলিং শিখিয়েছি যে ব্যায়ামটা করলে উপর হাতের সামনের দিকের পেশী অর্থাৎ বাইসেপসের উন্নতি হয়। আজকের ব্যায়ামটিতে হাতের পিছনের দিকের পেশী অর্থাৎ ট্রাইসেপসের উন্নতি হবে। ছবিতে একটি ছেলে ও মেয়েকে দুটি ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে। এই দুজনের গতিময় ছন্দের যোগফলই আজকের ব্যায়ামটি।

একটি দেড় বা দু ফুট উঁচু চেয়ারের উপর দু হাতের তালু পাত। হাত দুটির ভিতর ১০/১২ ইঞ্চি ফাঁক রেখে ছেলেটির অবস্থানে থাক। এখন শ্বাস নিতে নিতে মেয়েটির অবস্থানে চলে এস। পরমুহূর্তেই শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বা ছেলেটির অবস্থানে গিয়ে শ্বাস ছাড়। পুনরায় নামতে থাক এবং এই একই ভাবে ৮/১০/১৫ বা তোমার সাধ্যমতো বার অভ্যাস কর। প্রতিক্ষেপে ৩/৪ মাত্রায় অভ্যাস করবে। কিছুদিন অভ্যাসের পর হাত দুটিকে জমিতে রাখ এবং পাদুটি দেড় বা দু ফুট উঁচু চেয়ারে তুলে দিয়ে উল্টোভাবে কর। ওই একই ভাবে ৩/৪ মাত্রায়।

উপকারিতা: হাতের পিছনের পেশী ট্রাইসেপস ছাড়াও বুকের পেশীর অল্পবিস্তর উন্নতি হয় এই ব্যায়ামটিতে। তাছাড়াও কনুই ও হাতের নানান বাতজনিত ব্যথা দূর হয়। এই ব্যায়ামগুলি করবার আগে একটু ভাল করে পড়ে নিও, নাহলে করতে সুবিধা হবে। আর দু'একটি জিনিস সম্বন্ধে একটু সচেতন থেকো–

১। শিরদাঁড়া সব সময় সোজা ও টানটান থাকবে।

২। ছেলেটির অবস্থানে হাতের কনুই ভাঁজ থাকবে না অর্থাৎ হাত সোজা এবং টানটান হবে।

৩। মেয়েটির অবস্থানে যখন আসবে কনুইদ্বয় যেন শরীর থেকে ফাঁক না হয়ে যায়।

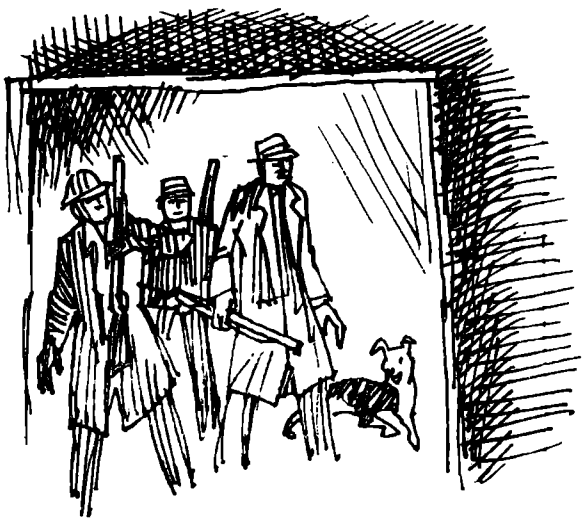

খোলা জানালা

প্রসেনজিৎ সরকার

ফ্র্যামটন নাটেল বসবার ঘরে ঢুকতেই হেসে এগিয়ে এল বছর পনেরোর একটি মেয়ে। দেখে বেশ চালাকচতুর মনে হয়। 'মিস্টার নাটেল, একটু অপেক্ষা করুন, মাসি এখনি আসছেন। ততক্ষণে আমিই না হয় আপনাকে একটু বিরক্ত করি।'

নাটেল কি বলে শুরু করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। স্নায়ুচাপের রোগ সারাতেই তাঁর হাওয়া বদলের জন্য এতদূর আসা। এভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে তাঁর আদৌ কোনো সুবিধা হবে কিনা সন্দেহ!

আসবার সময় তাঁর বোন বলেছিল, 'গ্রামের বাগানবাড়িতে যেতে চাও, যাও। কিন্তু আমি তো জানি, তুমি কি করবে। একা একা মুখ গুমরে পড়ে থাকবে। কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবে না। তাতে তোমার স্নায়ুচাপ বাড়বে বৈ কমবে না। তবু এই নাও কয়েকটা চিঠি। ওখানে আমার চেনাজানা কয়েকজনকে তোমার যাওয়ার কথা লিখে দিয়েছি। এই চিঠিগুলোও সঙ্গে নিও। ওঁরা তোমাকে নানাভাবে সাহায্য করবেন। মিসেস স্যাপ্‌লটন তো দারুণ আলাপী ভদ্রমহিলা।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর কথা বলল মেয়েটি, 'নতুন এলেন। এখানে কারুর সঙ্গে চেনাজানা হলো?'

'আমি এখানে কাউকেই চিনি না। আমার বোনকে অবশ্য অনেকেই চেনেন। এখানে এক স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন বছর তিনেক আগে।' বলল ফ্র্যামটন।

'আপনি তাহলে মাসির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না?' মেয়েটির চোখে জিজ্ঞাসা।

'সত্যি বলতে আমি শুধু ওঁর নাম আর ঠিকানাটা জানি।' স্বীকার করলেন ফ্র্যামটন। মিস্টার স্যাপ্‌লটন বেঁচে আছেন কিনা তাও জানবার কথা মনে হয়নি তাঁর।

'দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বছর তিনেক আগে। ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। তখন বোধহয় আপনার বোন এখানেই থাকতেন' শুরু করে মেয়েটি।

'দুর্ঘটনা?' চমকে ওঠে ফ্র্যামটন।

'আজকে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। অক্টোবর মাস। তার ওপরে বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেল। এখনো কেন উত্তরের ঐ বড় ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খোলা রাখা হয়েছে বলতে পারেন?'

ফ্র্যামটন তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই উত্তর দিকের বড় ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খোলা। ওটা সেই ধরনের জানালা, ইচ্ছা করলে যার

তলার অংশটাও পাল্লার মতো খোলা যায়। তখন ওটা হয়ে পড়ে একটা দরজা। ওপাশে সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে।

'অন্যবারের চেয়ে অবশ্য এবার ঠান্ডা কম। কিন্তু দুর্ঘটনার সঙ্গে ঐ জানালাটার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?'

'মেসোমশাই আর তাঁর দুই ভায়ের খুব শখ ছিল পাখি শিকারের। আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে ওঁরা তিন জন ঐ খোলা জানালাটা দিয়েই শিকারে বেরিয়েছিলেন। মেসোর হাতে ঝোলানো সাদা ওয়াটারপ্রুফ। ছোট ভাই গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন, 'একদিন সূর্যের ভোর....।' সেই শেষ বারের মতো যাওয়া। আর কোনোদিন তাঁরা ফিরে আসেননি! সেবছর প্রচন্ড বর্ষায় জলাভূমিটা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। ওখানেই কোথাও চোরাবালির ফাঁদে তলিয়ে গেছেন ওঁরা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, মৃতদেহগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

নিজেকে সামলে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল মেয়েটার। তবু সে বলতে লাগল, 'মাসি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করেন ওঁরা একদিন ফিরে আসবেন। ঐ খোলা জানালা দিয়েই বাড়িতে ঢুকবেন। সঙ্গে ওঁদের ছোট কুকুরটাও। তাই রোজ বিকেলে

'দুর্ঘটনা?' চমকে ওঠে ফ্র্যামটন।

জানালাটা খোলা রাখা হয় যতক্ষণ না বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। মাসির জন্য আমার দুঃখ হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এরকম বিকেলবেলা, যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো ওঁরা সত্যিই ঐ জানালা দিয়ে ফিরে আসবেন! ভাবতে ভয়ে সারা শরীর শিরশির্ করে ওঠে!' মেয়েটি দুহাতে মুখ ঢাকল।

ঠিক তখন মিসেস স্যাপ্‌ল্‌টন ঘরে ঢুকলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অনেকক্ষণ মিছিমিছি বসিয়ে রাখলুম। ভেরা দেখছি এর মধ্যেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছে আপনার সঙ্গে!'

'শুধু আলাপ! রীতিমত আস্তা জমিয়ে ফেলেছে।' ভয়াবহ আলোচনাটা থামতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ফ্র্যামটন।

মিসেস স্যাপ্‌ল্‌টন বললেন, 'উত্তরের ঐ জানালাটা খুলে রেখেছি বলে আপনার খুব শীত করছে না তো? আমার স্বামী দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পাখি শিকারে বেরিয়েছে। ফিরে আসবার সময় তো হয়ে গেছে। ওরা ওখান দিয়েই ভিতরে ঢোকে। সারাদিন বন-বাদাড়ে টো-টো করে ঘুরে, কাদা মেখে আমার পরিষ্কার মেঝেটার যা হাল করে। বলে বলেও ওদের এই অভ্যাসটা শুধরোতে পারলাম না।'

ফ্র্যামটন অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এরকম একটা দিনে এ বাড়িতে এসে পড়েছেন। বরাতটাই খারাপ। আলোচনাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, 'ডাক্তার আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। মানসিক উত্তেজনা তো নয়ই, এমনকি খুব একটা পরিশ্রম করাও বারণ। খাওয়া-দাওয়ায় অবশ্য অত নিয়মকানুন মেনে চলতে পারছি না।'

ভদ্রমহিলা কিন্তু তাঁর কথায় আমলই দিলেন না। বারবার তাকাতে লাগলেন উত্তরের খোলা জানালাটার দিকে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, 'ঐ ওরা এসে পড়েছে। ঠিক সময়েই ফিরেছে। ইস্, সারা গায়ে একেবারে কাদা মাখামাখি করে এসেছে!' আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

ফ্র্যামটনের মনে হলো তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। হঠাৎ চোখ পড়ল মেয়েটার ওপর। মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জানালাটার দিকে। অপলক দৃষ্টি। আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসছে দু চোখ। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল ফ্র্যামটনের। অজানা আশংকায় ঘুরে তাকালেন অভিশপ্ত খোলা জানালাটার দিকে।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আবছা আলোয় বাগানের ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে তিনটে মূর্তি। সোজা জানালার দিকেই আসছে! তাদের সবার হাতেই বন্দুক। একজনের কাঁধে একটা সাদা ওয়াটারপ্রুফ। তার আগে আগে আসছে একটা ছোট কুকুর। ওরা আরো কাছে আসতেই কানে এল একটা গানের সুর, 'একদিন সূর্যের ভোর....

ভয়াবহ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লেন ফ্র্যামটন। এক ঝটকায় তুলে নিলেন নিজের টুপি আর লাঠি। একলাফে দরজা পেরিয়ে দালানে। তারপর ঝড়ের বেগে বাগান পেরিয়ে গেট টপকে ছুটে বেরোলেন। উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল। কোনোরকমে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন ফ্র্যামটন। তারপর উঠেই আবার দৌড়।

জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর প্রথম ঢুকলেন মিস্টার স্যাপ্‌ল্‌টন। বলিষ্ঠ, সুঠাম চেহারা।–'ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আজকে। এক কাপ চা দাও না। খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে সারাদিন। আচ্ছা, কে যেন একজন এসেছিলেন মনে হলো? আমাদের দেখেই দৌড়ে পালালেন!'

'ভদ্রলোককে দেখিনি এর আগে। নাম তো বললেন ফ্র্যামটন নাটেল। অদ্ভুত মানুষ তো! নিজের অসুখ-বিসুখ নিয়ে বকবক করছিলেন। তারপর তোমাদের আসতে দেখে মনে হলো ভূত দেখার মতো ভয় পেয়েছেন। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ দৌড়!' মিসেস স্যাপ্‌ল্‌টন অবাক।

'আমার মনে হয় কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছেন', মুচকি হাসল ভেরা।–'আমাকে বলছিলেন কুকুর উনি একদম সহ্য করতে পারেন না। কবে কোন এক কবরখানায় একদল রাস্তার কুকুর নাকি ওঁকে তাড়া করেছিল। কোনোমতে একটা নালায় লাফিয়ে পড়ে সে যাত্রা রক্ষা পান। সারাদিন সেই কবরখানায় চুপ করে বসে কাটান। উফ্। ভয় পাবারই কথা।'

পাড়ার সবাই জানে বানিয়ে বানিয়ে গল্প ফাঁদতে ভেরার জুড়ি নেই।

সাকি (এইচ. এইচ. মানরো) রচিত 'দ্য ওপেন উইন্ডো' অবলম্বনে।

ছবিঃ সুফি

কলকাতায় জল সরবরাহ

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই যে জব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করলেন তারপর থেকে বহুদিন এখানকার মানুষজন গঙ্গার জলই পান করেছে। রান্না, খাওয়া, সাফ-সাফাই সবই গঙ্গার জলে। আর হবেই বা না কেন পবিত্র গঙ্গার স্রোতে তখন তো দূষণের বিষ ছিল না। ভাগীরথীর তীরে তীরে গজিয়ে ওঠেনি হরেক রকমের কলকারখানা আর সেখানকার আবর্জনা গড়িয়ে পড়েনি গঙ্গার বুকে। ফলে গঙ্গার জলে তখন বিষ ছিল না। মানুষ নির্ভয়ে ব্যবহার করত সে গঙ্গার জল। ক্রমে ক্রমে দিন পাল্টাল। গঙ্গার জলে বিষ ঢুকল। অপরিচ্ছন্ন হলো জল। বলতে গেলে আজকের হৈচৈ করা গঙ্গাদূষণের শুরু তখন থেকেই। সেই লর্ড ডালহৌসির সময় থেকেই। এ সময়েই গঙ্গার জলে দূষণের মাত্রা রীতিমত আতঙ্ক জাগিয়েছিল। সে কারণেই লর্ড ডালহৌসি বিকল্প চিন্তার কথা ভেবেছিলেন। মনে মনে ঠিক করেছিলেন দূষিত গঙ্গার জল ব্যবহার করা আর নয়, কলকাতার জন্য দরকার পরিস্রুত স্বাস্থ্যকর জল সরবরাহ ব্যবস্থা। দরকার যখন এবং স্বয়ং ডালহৌসি যখন দরকার মনে করেছেন তখন বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর হবে না কেন? কাজ শুরু হয়ে গেল। জায়গা ঠিক করা হলো পলতায়। ৪৮০ একর আয়তন নিয়ে কার্যক্রম এগিয়ে চলল জোর কদমে। এ জায়গাটা থেকে গঙ্গার দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইল। পলতা বেছে নেওয়া হয়েছিল তার অবস্থানের জন্যেই। উদ্যোক্তাদের ধারণা ছিল ঐ জায়গায় নদী থেকে জল টেনে নেওয়া যথেষ্ট সহজ হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের কাজ শুরু হয় ১৮৬৩ সালে। শেষ হতে সময় লেগেছিল সাত সাতটি বছর। আর এ উদ্যোগটি সম্পূর্ণ করতে সে বাজারেই খরচ পড়েছিল নয় নয় করে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা। গঙ্গা থেকে জল টেনে পলতা থেকে পরিস্রুত জল ছাড়ার তো ব্যবস্থা হলো কিন্তু সমস্যা যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আবার। এ জল সংরক্ষণ করা হবে কোথায়? তেমন জায়গা তো চাই যেখানে ধরে রাখা যাবে এই জল। সংরক্ষণের ব্যবস্থা দরকার এ ভাবনাটা মাথায় এলেও সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সুরাহা করা যায়নি। সরাসরি পলতার মেন পাইপের জলই কলকাতার প্রয়োজন মেটাত সে সময়। কলকাতার মানুষ তখন পলতা থেকে আসা মেন পাইপের জলই ব্যবহার করত। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিরিশ বছর এ ভাবেই চলেছিল। তবে পলতা থেকে সরবরাহ করা সে জল যে রীতিমত বিশুদ্ধ ছিল তা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না পলতার জলের বিশুদ্ধতা নিয়ে আজ হয়তো হাজারো সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তখন তা একেবারেই ছিল না ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত নিউম্যানস হ্যান্ডবুকেও পলতার জলের বিশুদ্ধতা নিয়ে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

এক সময় পলতার মেন পাইপের জল ব্যবহার করায় নানান অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। শহর বাড়ছিল। বেড়ে চলছিল মানুষজন। সাহেব সুবো আর উঠতি বেনিয়াদের উঁচু বাড়ি মাথা তুলতে শুরু করেছিল ভাগীরথীর তীরে জব চার্নকের শহরে। এসব কারণেই প্রয়োজন দেখা দিল একটি জলাধারের, বড়সড় একটি জলাধারের। সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা সাহেবদের মাথায় গোড়াতেই এসেছিল তা তো আগেই বলেছি। সে সময়েই তারা ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করেছিল মাটি থেকে বেশ উঁচুতে জল ধরে রাখার জন্য বেশ বড়সড় একট জলাধার দরকার। আর এমন ব্যবস্থা করা গেলে শহরের সব জায়গাতেই জলের চাপের একটা ভারসাম্য আনা যাবে। জলাধারের কাজে হাত পড়ল। কাজ শুরু হলো উত্তর কলকাতায় পাইকপাড়া এলাকায়। প্রচুর পরিশ্রম করে শেষ হলো জলাধার তৈরির কাজ। আর এটি চালু হল ১৯১১ সালের ১৬ মে। জলাধারের উচ্চতা মাটি থেকে ১৯০ ফুট। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ একই–৩২১ ফুট। মোট চারটি কক্ষে জল ধরে 80 হাজার টন। নাম টালার ট্যাঙ্ক। সারা কলকাতায় পরিস্রুত জল পৌঁছে দেওয়া হয় এই টালার ট্যাঙ্ক থেকেই। দীর্ঘকাল ধরেই টালার জলাধার তৃষ্ণার্ত কলকাতার মানুষের বাড়ি বাড়ি তৃষ্ণার জল পৌঁছে দিচ্ছে পাইপ যোগে। অবশ্যই তা পরিস্রুত জল। আর শুধুই কি তৃষ্ণা নিবারণ। মানুষ ঠাসা শহর কলকাতায় এখন জলের হাজারো প্রয়োজন। শুধু পানের প্রয়োজনই তো নয়। রান্না, সাফ সাফাই হাজারো প্রয়োজনেই জল দরকার। আর অবশ্যই তা পরিস্রুত হওয়া দরকার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। পলতার দেওয়া দায়িত্বটি টালা কলকাতার মানুষের প্রয়োজনে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে আসছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি, এই বিশাল জলাধারটি বানাতে খরচ পড়েছিল ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।

ছদ্মবেশে ম্যাম'জেল এক্স (গত সংখ্যার পর)

ম্যাম'জেল তার ফ্ল্যাটে ফিরে এসে নিনটিকে সব কিছু বললো।
আন্দ্রে লেজার্ড বড্ড বেশি আত্মবিশ্বাসী। বিশেষ কারণ না থাকলে হিমলার কখনোই তার ব্যক্তিগত সহচরকে পাঠাতো না। যেভাবেই হোক আমায় জানতে হবে কেন বার্লিন বিশেষ একজন অফিসারকে পাঠাচ্ছে।

হেনরি! নিনটি শীগগির জানলা খুলে দাও। কেউ যেন ওকে দেখতে না পায়!

এইরকম বোকার মতো ঝুঁকি নিয়ে তুমি এখানে এসো না হেনরি!
আমি দুঃখিত।
কিন্তু ম্যাম'জেল ওরা রেজিসটেন্স লিডার আন্দ্রে লেজার্ডকে ধরে ফেলেছে। আন্দ্রেকে জেনারেল ব্রাউউইচের হেড কোয়ার্টারে রাখা হয়েছে....

পরদিন সকালে ম্যাম'জেল তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সারলো.....
বি বি সি খবর দিয়েছে, রেজিসটেন্স এয়ারফোর্স কাল রাত্তিরে হামবুর্গে বোমা ফেলেছে... এ কী....ও!

বার্লিনের সেই স্পেশাল এজেন্টই আন্দ্রেকে ধরেছে। ওর কাজের ধরন দেখে জেনারেল পর্যন্ত ভয় পেয়েছে। হিমলারের ব্যক্তিগত সহচর তো! ম্যাম'জেল সাবধান....তোমায় এখন ভীষণ সাবধানে থাকতে হবে। লোকটা সাংঘাতিক!
[চলবে]

জানবে না কেউ

বিশ্বরঞ্জন দাস

দোকানের মালিক আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, আপনারা কি ছেলেটাকে টাকা দিয়েছিলেন? বখশিশ বোধহয়? ও কিন্তু টাকাটা আমাকে জমা দিয়ে দিয়েছে

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কিছুতেই নিতে চাইছিল না। তা, আপনাকে দিয়ে দিয়েছে! অবাক কান্ড!

অবাক হচ্ছেন, তাই না? ওর বাবা কারখানায় কাজ করতো। এ্যাকসিডেন্ট হয়। তারপর থেকেই পঙ্গু। ওর কোনো নালিশ নেই। আর কি পরিশ্রমই না করে! দেখতেই তো পাচ্ছেন।

ওয়াগন থেকে তেল খালাস করাচ্ছিলাম। সঙ্গে ডি-কে আর সোম। ওপন্ রেলওয়ে সাইডিং। শেড নেই। কাঁহাতক আর বেতো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। তাই পাশেই চায়ের দোকানে গিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকছিলাম। দেখলাম ছেলেটা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে দু কাপ চা খেয়েছো। আশি পয়সা খুচরো দাও। ফ্যাচ ফ্যাচ করতা হ্যায় কাহে? পনেরো টাকা বাটা দিয়ে খুচরো নিয়ে এসেছি নাই? ঠিক আছে। দুটো লেড়ো বিস্কুট নাও। তাহলেই পুরো এক টাকা হবে।

আবার কানে এল, গেলাস গরম জলে ধুয়ে দিয়েছি। মিছে কথা বলছি? পোটে জল নাই টিউকল থেকে জল নিয়ে এসে গরম করছি। আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। পয়সা বার করো কিন্তু। চা হয়ে গিয়েছে শুধু তিন কাপ চা হবে না। তিনটে কচুরি নিতে হবে। খুচরো-টুচরোর ঝামেলা কোরো না বলছি।

নয়-দশ বছর বয়েস। মুখে বুলডগের আদল। ছোট ছোট চুল। আড়ে একটু বেশি। তবে গাট্টাগোট্টা। সমানে হাত চলছে। মুখে খই ফুটছে হিন্দী, বাংলায়। কুলি, খালাসীরা হাসছে।

বললাম, কি রে? আমার কাছে কাজ করবি অফিসে?

ডিশ ধুতে ধুতে উত্তর দিলে, ও গপ্পো সবাই করে, দোকানের বাইরে গেলেই সব ভুলে যায়।

বললাম, না রে, আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। থাকবি?

গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, না, মালিককে ছেড়ে যাব না।

ডি-কে খুব ছোটাছুটি করছিল। সোম আসতে পারেনি আজ। ফার্স্ট স্লেসমেন্ট খালি হয়ে গেল। টেনে নিয়ে যাবে এখুনি। মাস্টারবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো বাজে। ডি-কে-কে বললাম, খেয়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে টিফিন এনেছি।

ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে। চান করেছে। বললাম, আমাদের সঙ্গে একটু খেয়ে নে না।

না আমি খাবো না। বাবুর বাড়ি থেকে আমার খাবার আসবে। আপনারা খেয়ে নিন।

টিফিন-বাক্সটা খুলতে যাচ্ছি। বলে উঠল, আমাকে দিন। পেলেটে করে দিচ্ছি। দুটো প্লেট গরম জলে ধুয়ে রুটি আর কপি চচ্চড়ি সাজিয়ে দিল। দু গ্লাস জল নিয়ে এল। খেতে শুরু করলাম। দোকানের বাইরে ছেলেটা কথা বলছে। কানে এল, তোর খিদে লেগেছে? আর একটু সবুর কর। এখ্খুনি খাবার এসে যাবে।

মুখ বাড়িয়ে দেখি, একটা কুকুর। ছেলেটা তার মাথায় হাত বুলোচ্ছে। কুকুরটা লেজ নাড়ছে।

খাওয়া হয়ে গেল। আমরা টিফিন-বাক্সটা ধুতে যাচ্ছি। লাফ দিয়ে চলে এল ছেলেটা। বলল, আমাকে দিন, আমাকে দিন। আপনাদের ধুতে হবে না। হাত ধুয়ে নিন আপনারা। জল দিচ্ছি।

শীতের সূর্য। পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। পাকুড় পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে ছেলেটার মুখের ওপর। বুলডগ কোথায় গেল! ধ্যানী বুদ্ধের আদল যে! হাত ধোওয়া হতেই টিফিন-বাক্স মাজতে বসে গেল ছেলেটা। আর থাকতে পারলাম না। দুজনেই বলে উঠলাম, হ্যাঁ রে তুই আমাদের জন্য এত কষ্ট করছিস কেন?

বা রে! আপনারা মানুষ না?

ছবি: ধ্রুব রায়

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনী

প্রেতপিশাচের অভিশাপ

অসিত মৈত্র

সিতাংশুর সঙ্গে অনেক রোমাঞ্চকর অভিযানে আমি সক্রিয় অংশ নিয়েছি, তবে মিশরের মমি রহস্যের সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা চলে না। সেই রহস্যের সমাধান সূত্রের অন্বেষণে, কলকাতার কলকোলাহল ছেড়ে সুদূর মিশরে ছুটে যেতে হয়েছিল আমাদের। প্রাচীন সম্রাট মেনহেরার শবাগার আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে মৃত্যুর যে ধারাবাহিকতা বয়ে যায়, সকলে তাকে অশুভ আত্মার অভিশাপ বলেই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সিতাংশু? তাহলে একবারে গোড়া থেকেই সমস্তটা শুরু করা যাক....

প্রাচীন মিশরের সম্রাট তুতাম-আমেনের শবাগার আবিষ্কার করে লর্ড কর্নারভন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দুজন ভারতীয় ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাস ও রমেশ যোশীও মিশরের মরুভূমিতে প্রাচীন মমির অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন। তার ফলেই কায়রোর কাছে সম্রাট মেনহেররার সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হলো। মেনহেররা ছিলেন অষ্টম শতাব্দীর অবক্ষয়িত যুগের সম্রাট সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন পুরোদস্তুর ঘুণ ধরেছে। অত্যাচার আর অনাচারে ছেয়ে গেছে সারা মিশর সে যুগের ইতিহাস সম্পর্কে এতদিন বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে এই ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেশি কাগজে কাগজে এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল।

এই আবিষ্কারের দু চারদিনের মধ্যে ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাস মারা গেলেন। ডাক্তাররা রায় দিলেন, মৃত্যুর কারণ করোনারি। তবে সাংবাদিকরা চিত্তাকর্ষক গল্পের খোরাক পেলে সহজে ছেড়ে কথা বলে না। মিশরের অনেক প্রাচীন মমির নামের সঙ্গে যে সমস্ত অভিশাপের কিংবদন্তী যুক্ত হয়ে আছে কোনো কোনো পত্রিকায় সেই সমস্ত কাহিনীও প্রকাশ পেতে শুরু করল।

দীপঙ্কর বিশ্বাসের মৃত্যুর দিন পনেরো বাদে রমেশ যোশীও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে নাকি তাঁর দেহের রক্ত বিষিয়ে গিয়েছিল। হস্তাখানেক বাদে যোশীর এক ভাইকে আমেদাবাদে তার নিজের ফ্ল্যাটে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। এরপরে সাংবাদিকদের আর ধরে রাখা গেল না। এতদিন ধরে যেটা নেহাৎই কুসংস্কার বলে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা চলছিল, তাই এখন ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে প্রকাশ্যে নিজের আসন দখল করে নিল। সম্রাট মেনহেররার রক্তলোলুপ বিদেহী আত্মার কিংবদন্তীমূলক যতগুলো গল্প প্রচলিত ছিল সে সমস্তই এখন জনসাধারণের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

এই সময় সিতাংশু একদিন শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। বিশ্ববিখ্যাত আর্কিওলজিস্টের বিধবা স্ত্রী পত্রে জানিয়েছেন, সিতাংশু যদি একবার সুবিধেমতো তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে তিনি সবিশেষ বাধিত হবেন। রহস্যভেদী হিসেবে সিতাংশুর নাম তাঁর সুপরিচিত। তিনি যে বর্তমানে ফার্ন

সেই সমস্ত কাহিনীও প্রকাশ পেতে শুরু করল।

রোডে তাঁর স্বামীর বাড়িতেই থাকেন, সে কথাটাও জানাতে ভোলেননি। বলা বাহুল্য, আমিও সিতাংশুর সঙ্গী হলাম।

ফার্ন রোডে যখন আমরা শ্রীমতী বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় দশটা। ফোনে আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। বেয়ারা এসে পথ দেখিয়ে দুজনকে ভেতরে নিয়ে গেল। স্বয়ং গৃহকর্ত্রী আমাদের জন্যে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন কালোপেড়ে শাড়ি পরে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি বসেছিলেন। চোখেমুখে গভীর অবসাদ আর হতাশার ছাপ। আমাদের দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

–সত্যিই যে আপনারা এসে হাজির হবেন....আমার মতো সামান্য একজনের জন্যে এতখানি কষ্টস্বীকার করবেন, তা আমি ভাবতে পারিনি। এরজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

হাত নেড়ে বাধা দিল সিতাংশু–কৃতজ্ঞতা কেন বলছেন? আপনার কাজে লাগতে পারলে খুশি হব। নিশ্চয় কোনো গুরুতর পরামর্শের জন্যেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

–হ্যাঁ। শ্রীমতী বিশ্বাস কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন–আপনি যে রহস্যভেদী তা জানি। কাগজে আপনার অনেক কাহিনীই পড়েছি। তবে শুধু সে কারণেই আপনাকে ডেকে পাঠাইনি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা মৌলিকতা আছে আর আপনার কর্মক্ষেত্রও বিশ্বব্যাপী, সে কারণেই.... অল্প থামলেন তিনি, তারপর ব্যাকুল দৃষ্টিতে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন–মিঃ মুখার্জী, আপনি কি অলৌকিকে বিশ্বাসী?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে সিতাংশুর একটু দেরি হলো। মনে হলো নিজেকে সে যাচাই করে দেখে নেবার চেষ্টা করছে।

–দেখুন, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন, এর মধ্যে ব্যক্তিগত মতামতের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। তাই নয় কী? সম্ভবত ডক্টর বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যুর প্রসঙ্গেই আপনি একথা জিজ্ঞেস করছেন?

–হ্যাঁ, সেই বিষয়েই। অকপটে স্বীকার করলেন ভদ্রমহিলা।

–আপনি কি আমাকে দিয়ে এই মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করাতে চাইছেন? শ্রীমতী বিশ্বাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সিতাংশু।

–মিঃ মুখার্জী, পরপর তিনটে মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রত্যেকটিরই নিজস্ব কারণ আছে। কিন্তু এই তিনটি ঘটনাকে যদি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় তবে তাদের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় না? মন কি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে না? সম্রাট মেনহেররার অভিশপ্ত সমাধিমন্দির আবিষ্কৃত হবার এক মাসের মধ্যেই পরপর তিনটে মৃত্যু, মৃত ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই এই আবিষ্কারের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। হয়তো এটা মিথ্যে কুসংস্কার। কিংবা হয়তো সত্যিই সুদূর অতীতের এক ভয়ংকর অভিশাপ, শতাব্দীর আঙিনা দিয়ে পায়ে পায়ে এতটা পথ পার হয়ে এসেছে, আধুনিক বিজ্ঞান তাই ওই মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বাস্তব ঘটনাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। পরপর তিন তিনটে মৃত্যু! কে বলতে পারে এখানেই এর সমাপ্তি ঘটবে কিনা! শেষের দিকে শ্রীমতী বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল।

–কার জন্যে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন?

–আমার ছেলে জয়ন্তর জন্যে। যখন আমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল তখন আমি অসুস্থ। আমার ছেলে সেই সময় সবেমাত্র কেমব্রিজ ইউনিভারসিটি থেকে পাঠ শেষ করে দেশে ফিরেছে। ও নিজে গিয়ে পিতার মৃতদেহ কলকাতায় নিয়ে এল। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়েই মিশরের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল। আমার হাজার অনুরোধ উপরোধ কিছুই কানে তুলল না। পিতার আরব্ধ কাজ ও শেষ করবেই। পুরাতত্ত্ব হচ্ছে ওরও প্রিয় বিষয়। আপনি আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ ভাবতে পারেন? কিন্তু সত্যিই মিঃ মুখার্জী, আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি। সারা দিনরাত এই একটি মাত্র চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলছে। এক মুহূর্তের জন্যেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। যদি সম্রাট মেনহেররার রক্তলোলুপ বিদেহী আত্মার পিপাসা এখনও না মিটে থাকে? এখনও যদি তার রক্ততৃষ্ণা জেগে থাকে? আমি হয়তো খুবই নির্বোধের মতো কথা বলছি

–না না, আপনার এতটা অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই, মিসেস বিশ্বাস। আমি নিজেও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী। এর প্রভাব যে কত গভীর....কত ব্যাপক....

স্তব্ধ বিস্ময়ে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই মুহূর্তে নিজের কান দুটোকেও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ ওর ভাবভঙ্গিতে ঠাট্টা তামাশার লেশমাত্র নেই। শান্ত সংযত ধীরস্থির সিতাংশু ঠিক সেই আগের মতোই আছে।

–তাহলে আপনার বক্তব্যের মূল

বিষয়, আমি শ্রীমান জয়ন্তকে এই ধরনের কোনো বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা করি ? কথা দিলাম, আমি তাকে সুস্থ এবং নিরাপদ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

–কিন্তু....কিন্তু আমি সাধারণ বিপদ-আপদের কথা বলছি না। যদি সত্যিই তেমন কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব কোথাও থেকে থাকে ?

–দেখুন, মিসেস বিশ্বাস, সিতাংশুর কণ্ঠস্বরে ঘন গাম্ভীর্য–মধ্যযুগে এই জাতীয় অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে নানারকম মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল। মনে হয় বর্তমান কালের মানুষদের চাইতে এসব বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল অনেক বেশি গভীর। যাক, এবার কাজের কথায় আসা যাক, যার সাহায্যে আমি অন্তত একটা পথের সন্ধান খুঁজে পেতে পারি। যতদূর শুনেছি ডক্টর বিশ্বাস বরাবর মিশরের প্রাচীন ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করে গেছেন। তাই নয় কি ?

–হ্যাঁ, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এই বিষয় নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস তাঁকে এক অপার্থিব আনন্দলোকে টেনে নিয়ে যেত। এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ছিল অগাধ।

–কিন্তু মিঃ যোশী ? তিনি তো নেহাৎ শখের খাতিরেই আপনার স্বামীর সংগী হয়েছিলেন বলে কাগজে পড়েছিলাম।

–হ্যাঁ, তাই। তিনি হচ্ছেন একজন কোটিপতি। যে কোনো ব্যাপারে একবার খেয়াল চাপলে হয়, চোখ বুজে টাকা খরচ করতে কোনোরকম দ্বিধা করতেন না। আমার স্বামী মিঃ যোশীকে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলেন এবং মূলত তাঁর টাকাতেই এই ব্যয়বহুল অভিযান শুরু হয়েছিল।

–আর তাঁর ভাই ? যে ভদ্রলোক নিজের ফ্ল্যাটে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন ? তাঁর মতিগতি কী রকম ছিল ? তিনিও কি প্রথম থেকে এই অভিযানের সংগে যুক্ত ছিলেন ?

–না, আমার তো মনে হয় না। কাগজে ভদ্রলোকের মৃত্যুসংবাদ পাঠ করেই আমি তাঁর অস্তিত্বের কথা প্রথম জানতে পারি। আমার বিশ্বাস, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাল সম্পর্ক ছিল না। কারণ মিঃ যোশীকে কোনোদিন তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজনের নাম উল্লেখ করতে শোনা যায়নি। তাহলে আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি সে কথা জানতে পারতাম।

–এই অভিযানে আর কে কে আপনার স্বামীর সংগে ছিলেন ?

–ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার মিঃ বিশ্বনাথন এ ছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামের একজন কর্মচারী। সঞ্জয় ভাটিয়া নামে অল্পবয়সী এক যুবক সেক্রেটারী হিসেবে সংগে ছিলেন। আর ছিলেন ডাক্তার অগস্তি ডাক্তার অগস্তি প্রথম জীবনে বহুদিন মিশরে ছিলেন। মিশর সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার সুবাদেই তাঁকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের অনেক দিনের পুরনো বিশ্বস্ত চাকর হাসানও বরাবর আমার স্বামীর সংগে থাকত। হাসান আদতে মিশরেরই অধিবাসী। আমার স্বামী অনেক খুঁজেপেতে তাকে সংগ্রহ করেছিলেন।

–সঞ্জয় ভাটিয়া সম্পর্কে কিছু জানেন ? ভদ্রলোক সেক্রেটারী পদে বহাল হলেন কোন সূত্রে ?

–এই অভিযানের প্রাক্কালে একজন সেক্রেটারী চাই বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে দেখেশুনে এই ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হয়। বয়স বেশি নয়। সাতাশ-আঠাশের মধ্যেই খুবই হাসিখুশি আর আমুদে স্বভাবের কাজেকর্মেও খুব চটপটে।

–ধন্যবাদ, মিসেস বিশ্বাস

–আর কিছু জানার থাকলে স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করতে পারেন।

–আপাতত আমার আর কিছু জানার নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হবে না

শেষের কথাগুলো অবশ্য খুব বেশি আশাপ্রদ নয়। শ্রীমতী বিশ্বাসের মুখের ভঙ্গিতেও তা টের পাওয়া গেল

সিতাংশু যে অলৌকিকে বিশ্বাসী সেটা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। ফেরার পথে এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর কথাবার্তাও হলো। কিন্তু দেখলাম ও অতিমাত্রায় সিরিয়াস।

–না না অজয়, সব ব্যাপারই অমন হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের জ্ঞানের চৌহদ্দি আর কতটুকু ! প্রায় সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তার বাইরে পড়ে আছে। অথচ এই সামান্য জ্ঞানের পুঁজি নিয়েই মানুষ নিজেকে মস্ত পণ্ডিত ভেবে বসে থাকে।

ওর সংগে তর্ক করে সময় নষ্ট করা বোকামি। তাই প্রসংগ পাল্টে বললাম–তুমি যে ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়ে এলে, কিন্তু কোথা থেকে কাজ শুরু করবে সে দিকটা একবার ভেবে দেখেছো ?

হেঁয়ালি ভরা দৃষ্টিতে সিতাংশু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল–ঠিক ঠিক, তুমি একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছো। কোথা থেকে শুরু করব সেটা যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার। রহস্যভেদের গোড়ার কথাই তাই। শুরুটা ঠিকমতো ধরতে পারলে পরিণতির দিকে সহজে অগ্রসর হওয়া যায়। তা না হলে বুনো হাঁসের পেছনে অযথা ঘুরে বেড়ানোই সার হবে। তবে এখন আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে রমেশ যোশীর ভাইয়ের মৃত্যুর পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা।

॥ ২ ॥

সিতাংশুর বাবা সুধাংশুশেখর ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁর সাহায্যে এই বিবরণ সংগ্রহ করা খুব বেশি কষ্টসাধ্য হলো না। আমেদাবাদ পুলিশের সংগে যোগাযোগ করে তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর এনে দিলেন। ভদ্রলোক রমেশ যোশীর বৈমাত্রেয় ভাই উদয় যোশী। খুব ছেলেবেলায় রমেশ যোশীর মা মারা যান। রমেশই তাঁর একমাত্র সন্তান। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর রমেশের বাবা অনেক বছর বিপত্নীক অবস্থায় দিন কাটান। অবশেষে প্রায় প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা রমেশকে তেমন সুনজরে দেখতেন না। সুযোগ পেলেই তাঁকে পীড়ন করতেন। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রমেশ একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তারপর শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় ব্যবসা শুরু করে ক্রমে ক্রমে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ওঠেন।

এদিকে রমেশের গৃহত্যাগের পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উদয়ের জন্ম হয়। কিন্তু সে বরাবরই উড়নচণ্ডী স্বভাবের। মায়ের অন্ধ স্নেহই তার প্রধান কারণ। প্রথম যৌবনে পা দিতে না দিতেই সে কুসংসর্গে

আপনারা নিশ্চয় মিঃ মুখার্জী আর মিঃ বোস ?

জড়িয়ে পড়ে। ফলে পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিল দুদিনেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সময় এক তহবিল তছরুপের মামলায় জড়িয়ে পড়ে তার মাস দুয়েকের জেল হয়ে যায়। জেল থেকে খালাস পাবার পর সে আর আমেদাবাদে ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে তার মা গত হয়েছেন। বাবা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তখনও পর্যন্ত সামান্য যা বিষয়সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল সে সমস্ত বিক্রি করে দিয়ে উদয় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে বছর আষ্টেক বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর পর হঠাৎ একদিন তাকে আবার আমেদাবাদের পথে দেখা গেল। তখন তার প্রায় কপর্দকহীন অবস্থা। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে কোনোরকমে কয়েকটা দিন কাটল। কিন্তু এভাবে আর কতদিনই বা চলতে পারে। অবশেষে সকলে মিলে চাঁদা তুলে উদয়কে তার দাদার কাছে মিশরে পাঠিয়ে দিল। রমেশ যোশী তখন মিশরেই ছিলেন। অনেক আশা নিয়ে উদয় তার দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেল, কিন্তু তার সে আশা সফল হয়নি। কিছুদিন বাদে দাদার নামে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে আবার আমেদাবাদেই ফিরে এল সে। তার দাদা নাকি হাজার বছরের পুরনো কংকালের পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে, কিন্তু তার একমাত্র ভাই মরলো না বাঁচলো সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমেদাবাদে ফিরে আসার পর পুরনো পাওনাদারদের জ্বালায় উদয় একবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার বন্ধুরাও তাকে আর তেমন পাত্তা দিত না। কোনোদিকে কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে সে অগত্যা গলায় দড়ি দিয়ে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটায়। মৃত্যুর প্রাক্কালে একটা চিঠিও সে লিখে রেখে গিয়েছিল। সে চিঠির ভাষাও কেমন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। মনে হয় শেষ সময় উদয় তার মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। চিঠিতে সে নিজেকে একজন কুষ্ঠরোগী বলে উল্লেখ করেছে। তার মতো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই নাকি অনেক শ্রেয়।

আমি নিজে এই মিশর রহস্যের একটা থিওরি খাড়া করলাম। ব্যাপারটা এমন হলেও হতে পারে। ধরা যাক, উদয় তার বৈমাত্রেয় ভাইকে খুন করার জন্যে বিষপ্রয়োগ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় ডক্টর বিশ্বাসের মৃত্যু হয়। হতবুদ্ধি হয়ে উদয় তড়িঘড়ি আমেদাবাদে ফিরে এল। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদার মৃত্যুসংবাদও তার কাছে এসে পৌছল। সে যে কী করে এসেছে এবারে সেটা তার মগজে ঢুকল। তারপর থেকেই বেচারা মনে মনে বিমর্ষ হয়ে পড়ল এবং শেষকালে অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

সিতাংশুকে আমার থিওরিটা ব্যাখ্যা করে বোঝালাম। ও-ও বেশ মন দিয়ে সমস্তটা শুনে গেল।

–সত্যিই তোমার চিন্তাধারার তুলনা মেলা ভার! এমনকি এটা সত্যিও হতে পারে। কিন্তু অজয়, একটা কথা তুমি দেখছি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ। তোমার কাহিনীতে সম্রাট মেনহেররার ভয়ংকর অভিশাপের প্রভাবটাই উহ্য থেকে গেল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম–তুমিও তাহলে ওইসব উদ্ভট ভূতুড়ে গল্পে বিশ্বাস কর ?

–আগে তো মিশর থেকে ঘুরে আসি। এসব প্রশ্ন তারপরে বিচার বিবেচনা করে দেখা যাবে।

॥ ৩ ॥

হপ্তাখানেক পরের কথা। আমাদের পায়ের নিচে সোনা রঙের বালুরাশি, দু-চোখের দৃষ্টি জুড়ে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। ক্রুদ্ধ সূর্যদেব মাথার ওপর অনর্গল অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন। সিতাংশুর চেহারার যা হাল হয়েছে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ধুলোতে বালিতে গরমে বেচারা একবারে বিপর্যস্ত। এই কদিনে ও বোধহয় হাজার বার 'হায় ভগবান' বলে বিধাতার কাছে আক্ষেপ জানিয়েছে।

আমরা প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে নেমেছিলাম। সেখান থেকে গাড়ি ধরে কায়রোয় হাজির হয়েছিলাম। তারপর সোজা প্যারামাউন্ট হোটেলে।

মিশরের রুক্ষ সৌন্দর্য আমার দুচোখ ভরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এমন রূপ জীবনে কখনও দেখিনি। তবে সিতাংশুকে ততটা বিমোহিত বলে বোধ হচ্ছে না। কোটপ্যান্ট পরে ও সারাক্ষণ যেমন ফিটফাট হয়ে থাকে এখনও তাই আছে। বাড়তির মধ্যে শুধু একটা ধুলো ঝাড়া ব্রাশ

সর্বদা হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই একটি মাত্র অস্ত্রের সাহায্যেই ও যেন সংখ্যাহীন অদৃশ্য বালুকণার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ একা একা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে! মুখে চোখেও ম্লান কালিমা ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

—একবার আমার বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ! সিতাংশুর গলায় করুণ অভিযোগের সুর—চৌরঙ্গীর সেরা দোকান থেকে সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে নরম চামড়ার এই জুতো আমি কিনেছিলাম। আজ কী হাল হয়েছে তার!

—দূরে স্ফিংক্স-এর ওই বিরাট আধা সিংহী আধা মানবী প্রস্তরমূর্তিটার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাও। সিতাংশুকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—পথশ্রমের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এখান থেকেই আমি ওকে ঘিরে যে রহস্য তার আভাস পাচ্ছি।

সিতাংশু বিরস দৃষ্টিতে সেই দিকে ফিরে তাকাল।—ওই বদখত পাথরটার মধ্যে এত কাব্যের গন্ধ কোথায় পেলে? ওর কণ্ঠে বেশ একটা ঝাঁঝের সুর ফুটে উঠল।

এবার আমারও রাগ চড়ে গেল। বললাম—জীবনভোর কেবল খুনে বদমাইশদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ালে, তুমি আবার সৌন্দর্যের মর্ম বুঝবে কি করে?

সিতাংশু সে কথার কোনো জবাব দিল না। একই রকম বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে সারি সারি পিরামিডের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকে চলল—অবশ্য এদের মধ্যে যে একটা সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতি আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকালের এইসব ইঞ্জিনীয়ারদের কারিগরি বিদ্যার প্রশংসা করতেই হয়। কিন্তু জমিটা উঁচুনিচু হওয়ার ফলে পুরো জিনিসটাকেই খুব দৃষ্টিকটু করে তুলেছে। আবার এই পামগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, এদের বিন্যাসপদ্ধতির মধ্যে সুচিন্তিত সংহতির একান্তই অভাব। এলোমেলো খাপছাড়াভাবে এখানে ওখানে গজিয়ে উঠেছে।

সিতাংশুর ক্লান্তিকর হা-হুতাশ থামিয়ে দেবার জন্যে বললাম—চল, এবার প্রকৃত গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করা যাক। রথ প্রস্তুত।

হোটেল প্যারামাউন্ট থেকে বাকি পথটা উটের পিঠে যাব। উটগুলোও যথোচিত ভদ্রতা সহকারে আমাদের অপেক্ষায় তপ্ত বালির ওপর উপুড় হয়ে বসে আছে। কজন স্থানীয় বালক তাদের পরিচর্যায় ব্যস্ত।

এতক্ষণ সিতাংশু তবু কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল কিন্তু উটের পিঠে ওঠবার পর তাকে আর কোনোমতে ধরে রাখা গেল না। তার উৎকণ্ঠা আর হা-হুতাশ মাঝে মাঝে আতঙ্কিত চিৎকারে পর্যবসিত হল।

অবশেষে আমরা অভীষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছলাম। রোদে পোড়া তামাটে রঙের এক ভদ্রলোক আমাদের দেখে সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর পরনে সাদা প্যান্ট, মাথায় সোলার টুপি।

—আপনারা নিশ্চয় মিঃ মুখার্জী এবং মিঃ বোস? আপনাদের তার আমরা যথাসময়েই পেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমাদের কারুর পক্ষে কায়রোয় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি।

সিতাংশুর মুখচোখ পলকে বিবর্ণ হয়ে উঠল। কোটের পকেট থেকে সবেমাত্র ধুলো-ঝাড়া ব্রাশটা বার করেছিল সেটা তার হাতের মধ্যেই ধরা রইল।

—আপনি নিশ্চয় আমাদের কোনো মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছেন না?

ভদ্রলোক ম্লান মুখে মাথা নাড়লেন—হ্যাঁ, মৃত্যুই!

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—জয়ন্ত বিশ্বাস কি মারা গেছে?

—না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মচারী মিঃ ডেভিড উইলিয়াম।

—মৃত্যুর কারণ? সিতাংশুর গলার স্বর ঘন গম্ভীর।

—ধনুষ্টঙ্কার।

হঠাৎই আমার যেন দম বন্ধ হয়ে এল। নিজের চারপাশে এক অশুভ কালো ছায়া দেখতে পেলাম।

সিতাংশুর অবস্থাও ঠিক আমার মতো। পুরনো অভ্যাস বশে মৃদুস্বরে বিড়বিড় করল—কিছুই যে ছাই বুঝে ওঠা যাচ্ছে না! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মিঃ উইলিয়াম যে ধনুষ্টঙ্কারেই মারা গেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই তো? শেষের কথাগুলো আগন্তুক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলা।

—না, কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ অগস্তির কাছে গেলেই সমস্ত কিছু জানতে পারবেন।

—আপনি তাহলে ডাক্তার নন?

—আমি বিশ্বনাথন।

শ্রীমতী বিশ্বাসের কাছে বিশ্বনাথনের নাম আগেই শুনেছিলাম। ভদ্রলোককে দেখে মাদ্রাজী বলে বোঝা যায় না। দীর্ঘ ঋজু চেহারা। তার মধ্যে একটা কোমল ভাব আছে যা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে।

—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। তিনি আমাদের আহ্বান জানালেন—জুনিয়ার বিশ্বাস আপনাদের জন্যেই ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।

বিশ্বনাথনকে অনুসরণ করে আমরা একটা বড় তাঁবুর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। তিনজন ভদ্রলোক কোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিলেন। একজনের বয়স খুবই কম। চব্বিশ পঁচিশের মধ্যেই।

বিশ্বনাথন সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন—মিঃ মুখার্জী এবং মিঃ বোস।

অল্পবয়স্ক যুবকটি দৌড়ে এসে আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্যে হাত বাড়াল। ছেলেটির উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ওর মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চেহারাটা এখনও আর দুজন সঙ্গীর মতো ততটা রোদে-পোড়া হয়নি, কিন্তু দুচোখে গভীর হতাশার ছাপ। সারা মুখ উৎকণ্ঠায় পাণ্ডুর। তার ফলেই বয়সটা যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। জয়ন্ত বিশ্বাস যে মানসিক দিক থেকে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সেটা বুঝে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না।

বিশ্বনাথনের মাধ্যমে অপর দুই ভদ্রলোকের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হলো। একজন ডাক্তার অগস্তি। বয়স আন্দাজ চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে। মাথার চুলগুলো সামান্য কোঁকড়ানো। অন্যজন সাতাশ-আঠাশ বছরের যুবক, সেক্রেটারী মিঃ ভাটিয়া।

॥ ৪ ॥

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চালাবার

পর মিঃ বিশ্বনাথন ও মিঃ ভাটিয়া তখনকার মতো বিদায় নিলেন। তাঁবুর মধ্যে কেবল আমরা চারজন। আমি, সিতাংশু, জয়ন্ত এবং ডাক্তার অগস্তি।

–আপনি আমায় যে কোনো প্রশ্ন করুন, মিঃ মুখার্জী। ম্লান মুখে জয়ন্ত বলল–দুর্ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা সকলেই ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সমগ্র কাণ্ডকারখানা এতই অবিশ্বাস্য....

তার কথার সুরে ভয় পাওয়া, ভেঙে পড়া ভাব। লক্ষ্য করে দেখলাম সিতাংশুর অনুসন্ধানী দৃষ্টি স্থিরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করছে।

–তুমি কি এর পরেও এই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে আগ্রহী?

জয়ন্ত বিশ্বাসের চোখ মুখ মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল–হাঁা, নিশ্চয়! কোনো বাধা-বিপত্তিকেই গ্রাহ্য করব না। তা সে অদৃষ্টে যত দুর্ভোগই থাকুক না কেন।

সিতাংশু এবার দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করল–এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত, ডাক্তার অগস্তি?

ভদ্রলোক উত্তর দিতে কিছুটা ইতস্তত করলেন–আমারও ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই।

সিতাংশু তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকালো। যেন আপন মনে কোনো কিছু চিন্তা করছে অবশেষে ধীরে ধীরে মুখ তুলল–তাহলে এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, বর্তমানের এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কথা ঠিকভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখা। আচ্ছা, মিঃ উইলিয়াম কবে মারা গেছেন?

–দুদিন আগে, গত বধুবারে।

–তাঁর যে ধনুষ্টংকার হয়েছিল, এ ব্যাপারে আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?

–অবশ্যই।

–নাক্সভোমিকার বীজ থেকে স্ট্রিকনাইন নামে যে বিষ পাওয়া যায়, এখানে সে রকম কিছু ঘটেনি তো? মানবদেহে দুটোর লক্ষণই কিন্তু অনেকটা একই ধরনের।

–না, মিঃ মুখার্জী। আপনি যা বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি। তবে এটা নিশ্চিতভাবেই ধনুষ্টংকার।

–আপনি কি অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন?

–দিয়েছিলাম–সবরকম ভাবেই চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু....

–অ্যান্টিসিরাম কি আপনার সঙ্গেই থাকে?

–না। লোক পাঠিয়ে কায়রো থেকে আনাতে হয়েছিল।

–ইতিপূর্বে এখানে কি আর কোনো ধনুষ্টংকারের কেস আপনার হাতে এসেছে?

–না, একটাও না। জোরের সঙ্গে মাথা নাড়লেন ডাক্তার অগস্তি।

–আর একটা প্রশ্ন। মিঃ রমেশ যোশী যে ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই তো?

–সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে মিঃ যোশীর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ছুরিতে কেটে যায়। একটা পেন্সিল কাটতে গিয়েই ঘটনাটা ঘটেছিল। ভদ্রলোক তখন তেমন নজর দেননি। সেখান থেকেই কেমন করে সেপটিক হয়ে যায়। অবশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে দুটোই একই রকম বলে মনে হতে পারে।

–তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিঃ উইলিয়ামকে নিয়ে আমরা পরপর চারটে মৃত্যুর সম্মুখীন হলাম। এবং প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন। রক্ত বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয়জনের মৃত্যু ঘটল। তৃতীয়জন আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন এবং চতুর্থজনের মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টংকার....

ডাক্তার অগস্তি কথা না বলে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন।

–এই চারজনের মৃত্যুর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন?

–আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

–আমি বলতে চাই এই চারজন কি এমন কোনো কাজ করেছিলেন, যার ফলে সম্রাট মেনহেররার আত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে?

অগস্তি বড়বড় চোখ তুলে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন–আপনি কি সত্যিই ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করছেন, মিঃ মুখার্জী? মনে হচ্ছে খবরের কাগজের গাঁজাখুরি গল্পকথা আপনার মাথার মধ্যেও বেশ জেঁকে বসেছে!

জয়ন্ত বিশ্বাসও এই সমস্ত গালগল্প সম্পর্কে বিড়বিড় করে কী একটা বিরূপ মন্তব্য করল। সিতাংশুর কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কে কী ভাবল না-ভাবল তাতে যেন তার কিছু যায় আসে না। দুচোখে আগের মতোই নির্বিকার দৃষ্টি।

–তাহলে ডাক্তার অগস্তি, আপনি এই কিংবদন্তী আদৌ বিশ্বাস করেন না?

–না মশাই, ওসব ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের ছাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাইরে কোনো কিছুই স্বীকার করি না।

–প্রাচীন মিশরে কি কোনো বিজ্ঞান ছিল না?

নির্দিষ্ট কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করেই স্বগতোক্তির মতো প্রশ্নটা উচ্চারণ করল সিতাংশু। মুখ দেখে মনে হলো ডাক্তার অগস্তি কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। সিতাংশু তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যে মৃদু হেসে বলল–না....না, আমি কোনো উত্তর চাইছি না। আর একটা কথা, এখানে স্থানীয় অধিবাসী যারা কাজ করত এ বিষয়ে তাদের কী ধারণা?

–যেখানে সভ্য মানুষেরাই এতখানি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, সেখানে নিরক্ষর অধিবাসীরাও যে কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! তারা সকলেই বড় বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে! তবে এখনও পর্যন্ত তাদের কোনো বিপদ আপদ দেখা দেয়নি বলেই কোনোরকমে শান্ত হয়ে আছে। একবার কিছু একটা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের মতো দল বেঁধে হাওয়া হয়ে যাবে।

–হুঁ, বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখার মতো। মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করল সিতাংশু।

–আপনি নিশ্চয় এই সমস্ত আজগুবি গল্প বিশ্বাস করেন না? জয়ন্ত বিশ্বাস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিতাংশুর দিকে ফিরে তাকাল–আর এ জাতীয় কুসংস্কারকে মনে স্থান দিলে প্রাচীন মিশরের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যই আমাদের কাছে চির অজ্ঞাত থেকে যাবে।

সিতাংশু এ প্রশ্নের সোজাসুজি কোনো জবাব দিল না। তার বদলে কোটের পকেট থেকে ছোট সাইজের একটা জরাজীর্ণ বই বার করে সামনের টেবিলের ওপর রাখল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখলাম, বইটার নাম 'প্রাচীন মিশরের মন্ত্রতন্ত্র ও

প্রেতবিদ্যা'। বইটা হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলাতে দোলাতে তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সিতাংশু।

ডাক্তার অগস্তি সিতাংশুর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

–ভদ্রলোকের মতলবখানা কী?

এতবার সিতাংশুর মুখ থেকে নানান পরিবেশে এই কথাটা শুনেছি যে অপরের মুখে কথাটা শুনে মনে মনে হাসি পেল। সে ভাব দমন করে বিব্রত কণ্ঠে বললাম–আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে বিদেহী আত্মার অশুভ প্রভাব এড়াবার জন্যে কোনো উপায় অন্বেষণ করছে।

সিতাংশুর খোঁজে তাঁবুর বাইরে বেরুলাম। দেখলাম ও সেক্রেটারী সঞ্জয় ভাটিয়ার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। একটু এগিয়ে যেতেই ভাটিয়ার গলার স্বর শোনা গেল। ভদ্রলোক বলছিলেন–আমি মাত্র দু মাস হলো এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত আছি। হ্যাঁ, মিঃ যোশীর সম্পর্কে অনেক খবরই আমি জানি।

–তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই উদয় যোশীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেন?

–ভদ্রলোককে একদিন মাত্র দেখেছিলাম। এক শনিবার দুপুরবেলা তিনি এখানে এসে হাজিরা হন। নাম বললেন উদয় যোশী। চেহারাটা মন্দ নয়, তবে শরীরের ওপর যে অনেক অন্যায় অত্যাচার চালিয়েছেন সেটা একবার দেখলেই বোঝা যায়। কেমন যেন পোড় খাওয়া, শুকনো ধরনের। আমার সঙ্গে ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের কোনো পরিচয় না থাকলেও ডাক্তার অগস্তি বোধহয় উদয়বাবুকে আগে থেকেই চিনতেন। কিন্তু মিঃ রমেশ যোশী ভদ্রলোকের নাম শুনেই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। তাঁকে একরকম তাড়িয়েই দিলেন তাঁবু থেকে। বললেন, তোমাকে তো আমি এক কপর্দকও দেব না, এমন কি আমার মৃত্যুর পরেও তুমি আমার বিষয়-সম্পত্তির ছিটেফোঁটাও যাতে না পাও সে ব্যবস্থাও আমি করে যাব। এই অভিযানের পেছনেই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করব। এ বিষয়ে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলার জন্যে এখনই ডঃ বিশ্বাসকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।....এই ধরনের আরও অনেক গরম গরম কথাবার্তা বললেন। তারপর উদয়বাবু আর বৃথা কালক্ষেপ না করে পত্রপাঠ সেখান থেকে দেশে ফিরে গেলেন।

–ভদ্রলোক কি তখন বেশ সুস্থ শরীরেই ছিলেন?

–মিঃ রমেশ যোশীর কথা বলছেন?

–না, আমি তাঁর ভাই উদয় যোশীর কথা বলছি।

–ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে একবার তাঁর নিজের কী এক অসুখের কথা বলেছিলেন। তবে সেটা নিশ্চয় তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তা হলে আমার মনে থাকত।

–রমেশ যোশী কি কোনো উইল করে গিয়েছিলেন?

–আমি যতদূর জানি, তিনি কোনো উইল রেখে যাননি।

সিতাংশুকে কিছুটা চিন্তান্বিত মনে হলো–মিঃ ভাটিয়া, আপনার নিজের অভিপ্রায়টা কি? আপনিও কি এই অভিযানের সঙ্গে শেষপর্যন্ত যুক্ত থেকে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন?

–না না, যত শীগগির সম্ভব আমি পাটনায় ফিরে যেতে চাই। পা বাড়িয়ে বসে আছি বলতে পারেন। এখানকার ঝামেলাটুকু মিটিয়ে ফেলতে যা বাকি মেনহেররার রক্ততৃষার শিকার আমি হতে চাই না। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন ভদ্রলোক।

সিতাংশুর মুখে চোখে হাসির আভাস পেলাম।

–মনে রাখবেন, মেনহেররার বিষ নিঃশ্বাস সুদূর আমেদাবাদেও গিয়ে পৌঁছেছে!

ভাটিয়া হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থিরভাবে। দুচোখে ভয়াল আতঙ্কের ছাপ।

–ভদ্রলোক সত্যিই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আমার সঙ্গে যেতে যেতে মৃদু গলায় মন্তব্য করল সিতাংশু।

সিতাংশুর মুখের দিকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু ওর গোবেচারী হাসির আড়ালে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তার কোনো হদিস খুঁজে পেলাম না।

॥ ৫ ॥

জয়ন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে মূল সমাধিমন্দিরে নিয়ে গেল। মিঃ বিশ্বনাথনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঐতিহাসিক গবেষণার পক্ষে অমূল্য দ্রব্যগুলি আগেই কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট যা পড়ে আছে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়। অষ্টম শতাব্দীর কারুকার্য করা আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে বিস্ময়ে চোখ ভরে ওঠে।

সিতাংশু ঘুরে ঘুরে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তবে ওর চোখে কোনো বিস্ময়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলাম না। ভাবভঙ্গি কেমন নিস্পৃহ।

ঘণ্টাখানেক বাদে আমরা আবার আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলাম। আমাদের দুজনের জন্যে একটা বড় তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নৈশভোজে যোগ দেবার জন্যে হাত মুখ ধুয়ে আমাদের প্রস্তুত হয়ে নিতে বলল জয়ন্ত। তাঁবুর মধ্যে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সিতাংশুর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছিলাম, এমন সময় পর্দা সরিয়ে কালোরঙের দশাসই চেহারার এক পুরুষ আমাদের সামনে এসে খাঁটি আরবীয় কায়দায় ঘাড় ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল।

সিতাংশু তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল–তোমার নাম কি হাসান!

–হাঁ, হুজুর, আমি আগে বড়বাবুকে দেখাশুনা করতাম। এখন তাঁর ছেলের তদারকি করি।

লোকটা আমাদের আরও কাছে সরে এসে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল–শুনলাম আপনারা জ্ঞানীগুণী পন্ডিত ব্যক্তি। ভূতপ্রেত তাড়াবার মন্ত্রতন্ত্র সব আপনাদের জানা আছে। দয়া করে ছোটবাবুকে বুঝিয়ে বলুন, এ জায়গাটা মোটেই ভাল নয়। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যাওয়া যায় ততই ভাল।

তারপর আর কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখে মনে হয় যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল লোকটা।

–সত্যিই বাতাসে একটু অশুভ গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে! হেঁয়ালী ভরা গলায় বিড়বিড় করল সিতাংশু–আমি নিজেও তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি।

॥ ৬ ॥

আমাদের সেদিনের নৈশভোজটা খুব

একটা আনন্দপূর্ণ হলো না। একমাত্র মিঃ বিশ্বনাথন কথায় বার্তায় কোনোরকমে আসরটা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। আলোচনাটা চলছিল প্রাচীন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদানের প্রসংগ নিয়ে। মিশরীয় দস্যুরা যে কত মূল্যবান ঐতিহাসিক নথিপত্রের ক্ষতিসাধন করে গেছে ডাক্তার অগস্তি সে সম্পর্কে দু চার কথা বললেন কথায় কথায় অনিবার্যভাবে অভিশপ্ত মমিদের প্রসংগও এসে পড়ল সিতাংশুই যেন ইচ্ছে করে টেনে আনল প্রসংগটা। কিন্তু সকলেই দেখলাম বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইছে। তাই আলোচনাটা আর বেশিদূর এগোলো না।

ভোজনপর্ব সমাধা করে আমরা যখন যে যার নিজের তাঁবুতে ফেরার উপক্রম করছি, জয়ন্ত হঠাৎ সিতাংশুর হাত ধরে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। আমরাও সকলে সেদিকে ফিরে তাকালাম আবছা অন্ধকারের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি সারিসারি তাঁবুর পাশ দিয়ে চকিতে দেখা দিয়েই আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ছায়ামূর্তির মাথাটা যে অবিকল কুকুরের মতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাধিমন্দিরের দেওয়ালের গায়ে এই ধরনের হাতে আঁকা ছবি ইতিপূর্বেই দু চারটে দেখেছিলাম।

–হায় ভগবান! মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করল সিতাংশু–অ্যামিবাস....প্রেত-লোকের দেবতা!

–কেউ বোধহয় আমাদের সংগে তামাসা করছে! ডাক্তার অগস্তি চাপা কণ্ঠে গর্জন করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

–মিঃ ভাটিয়া, ছায়ামূর্তিটা যেন আপনার তাঁবুর দিকেই গেল না? অসহায় ভংগিতে হাত নাড়ল জয়ন্ত।

–না। সিতাংশু মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল–ডাক্তার অগস্তির তাঁবুর দিকে।

ডাক্তার অগস্তি কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সিতাংশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিশ্বনাথনের দিকে ফিরে তাকিয়ে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন–নিশ্চয় কেউ আমাদের সংগে তামাশা করছে! চলুন, ব্যাটাকে ধরা যাক।

বিশ্বনাথন কী করা উচিত তাই ভাবছেন, কিন্তু অগস্তি আর দাঁড়ালেন না। দৃঢ় পায়ে অন্ধকারের মধ্যে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এভাবে চুপচাপ ভীরুর মতো দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার নিজের কাছে কেমন কাপুরুষতার পরিচয় বলে মনে হলো। আমিও ডাক্তারকে অনুসরণ করে দৌড়ে গেলাম। সকলে উপস্থিত থাকতে ভদ্রলোক বিপদে পড়বেন, সেটা কোনোমতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সমস্ত অনুসন্ধান বৃথা হলো। ক্ষণপূর্বে দেখা সেই ছায়ামূর্তির কোনো হদিস খুঁজে পেলাম না। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সেটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। খানিকটা ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাঁবুতে ফিরে এলাম। একটা অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যেন চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরতে চাইছে। অজানা আশংকায় ছমছম করছে বুকের ভেতরটা। কী যে ঘটতে চলেছে ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি সিতাংশু তার শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে ইতিমধ্যে এক কান্ড বাধিয়ে বসে আছে। সবটা ওর নিজস্ব পদ্ধতি। হাঁটু গেড়ে বসে তাঁবুর চারপাশে বালির ওপর নানারকম আঁকিবুকি কাটতে শুরু করেছে। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, মাঝে মাঝে পাঁচ-সাত কোণ বিশিষ্ট তারকা চিহ্ন। এই ধরনের আরও অসংখ্য ছবি। সংগে সংগে বিড়বিড় করে মন্ত্র বলে চলেছে এক নাগাড়ে। কী করে অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা যায় সে সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথিপত্রে যে সমস্ত ফলপ্রসূ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা আছে তারই নানান ফিরিস্তি।

মিঃ বিশ্বনাথন নিজের অন্তরের রাগকে আর কিছুতে চেপে রাখতে পারলেন না। আমার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ উত্তেজিত ভংগিতে বললেন–ভদ্রলোক যে এতটা নির্বোধ সেটা আগে ধারণা করতে পারিনি। অথচ এমন ভাব দেখান যেন সব বিষয়েই অগাধ পান্ডিত্য। মধ্য যুগে প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্রের সংগে যে প্রাচীন মিশরের অলৌকিক যাদুবিদ্যা চর্চার অনেক তফাৎ, এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও তাঁর নেই।

বিশ্বনাথনকে কোনোরকমে শান্ত করে তাঁবুতে ফিরে এলাম। সিতাংশু তখন খুশির জোয়ারে উপচে উঠছে। চোখে মুখে প্রশান্তির স্নিগ্ধ আমেজ–আর কোনো ভয় নেই, অজয়। তুমি এখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পার। আমার খানিকটা গভীর ঘুমের প্রয়োজন। সারাদিনের প্রচন্ড গরমে মাথাটা ভীষণ ধরে গেছে। শেষবারের কফিটা আনতে কেন যে এত দেরি করছে....

সিতাংশুর প্রার্থনা শুনেই বোধহয় ধূমায়িত পেয়ালা হাতে হাসান ভেতরে ঢুকল। গরম কফির মধুর সৌরভ আমারও নাকে এসে লাগল। রাতে শোবার আগে এক কাপ কফি পান করা সিতাংশুর বরাবরের অভ্যাস। এর ফলে নাকি ঘুমের মধ্যেও ওর ব্রেন বেশ ভাল কাজ করে। অনেক দুরূহ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে পায়। আমাকেও এক পেয়ালা দেবে কিনা জানতে চাইল হাসান। আমি মানা করে দিলাম। দেশী প্রথায় অভিবাদন জানিয়ে হাসান বিদায় নিল। কফির পাট চুকলে পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম। সারাদিনের ক্লান্তি শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা হয়ে আছে। চোখের পাতা দুটোও সীসের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। তবু শোবার আগে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক ঝলক। রাতের মরুভূমির অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখে প্রাণটা পুলকিত হয়ে উঠল। নীল তারার ফুলকি সারা আকাশে ছেয়ে আছে। নিচে দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি।

–কী অপূর্ব দৃশ্য! সিতাংশুকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি–আবার এই রহস্যটার মধ্যেও একটা অভূতপূর্ব মাদকতা জড়িয়ে আছে। অতীত ইতিহাসের স্বপ্নমদির ধূসর গন্ধ ছড়ানো। মরুভূমির এই রুক্ষ বালুরাশির মধ্যেই বিরাট এক সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটে গেছে। সমস্ত দৃশ্যটা একবার চোখ বুজে কল্পনা করে দেখ!

সিতাংশুর দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ঈষৎ বিরক্তির দৃষ্টিতে ফিরে তাকালাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ওর এই অনীহা আমার কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু ব্যাপার দেখে হৃৎপিন্ড লাফিয়ে উঠল। সিতাংশু সোফার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার চিহ্ন। ওর পাশেই শূন্য কফির পেয়ালা।

–ডাক্তার অগস্তি! ডাক্তার

অগস্তি! তাড়াতাড়ি একবার এদিকে আসুন। আমার গলা দিয়ে একটা আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে এল।

হন্তদন্ত হয়ে অগস্তি ছুটে এলেন—কী ব্যাপার?

—আমার বন্ধু হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বোধহয় মারা যাচ্ছে! ওই কফিটা থেকেই এমন সর্বনাশ ঘটেছে। হাসান....হাসানই দিয়ে গেল কফিটা। নিশ্চয় কোনো মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছে পেয়ালার মধ্যে। ও যেন কোনোরকমে পালাতে না পারে।

—তবে ভাগ্য ভাল, কফিটা আমি শেষ পর্যন্ত পান করিনি। কার শীতল কণ্ঠস্বর বন্ধুর মতো কানে এসে বাজলো। দুজনে অবাক চোখে ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখ মিটমিট করতে করতে ধীরে ধীরে সোফার ওপর উঠে বসেছে সিতাংশু। ওর ঠোঁটের আগায় সবজান্তার সূক্ষ্ম হাসি।

—না, ওই বিষাক্ত কফি আমি পান করিনি। স্বভাবসুলভ মৃদু গলায় সিতাংশু বলে চলল—আমার বন্ধু অজয় যখন রূপসী রাত্রির মোহিনী মায়ায় বিভোর হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে গলায় না ঢেলে কফিটা আমি একটা ফ্লাস্কে ঢেলে রেখেছি। কাল সকালে ওটা পরীক্ষার জন্যে কেমিস্টের কাছে পাঠানো হবে।

ডাক্তার অগস্তি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সিতাংশুর দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু সিতাংশুর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। এমনটা যে ঘটবে ও যেন আগে থেকেই অনুমান করে রেখেছে। ধীর শান্ত স্বরে বলল—আপনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, কেন মিথ্যে ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছেন! ইতিমধ্যেই ফ্লাস্কটা আমি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। এখন হাজার চেষ্টা করেও কোনো লাভ হবে না, শুধু পরিশ্রমই সার হবে। আরে আরে! এ কী করছেন! অজয়, ভদ্রলোককে আটকাও।

সিতাংশুর উৎকণ্ঠাকে ভুল বুঝলাম। ভাবলাম সত্যি সত্যিই ডাক্তার অগস্তি হয়তো সিতাংশুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। সেই ফাঁকে ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে পিছিয়ে এসে পকেট থেকে একটা সাদা ট্যাবলেট বার করে মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। অ্যাসিডের উগ্র গন্ধে তাঁবুটা ভরে উঠল। পরমুহূর্তেই তিনি কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

—মেনহেররার আর এক শিকার! তবে এই শেষ। সিতাংশুর গলায় গভীর বিষাদের সুর—বোধহয় এই ভাবে শেষ হওয়াটাই সবচেয়ে ভাল হলো। নিজের হাতে তিন তিনটে খুন করেছেন ভদ্রলোক।

॥ ৭ ॥

—এ সমস্তই তাহলে ডাক্তার অগস্তির কীর্তি? কথা হারিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলাম আমি—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব?

—আমাকে ভুল বুঝো না বন্ধু। মানুষের মনে অশুভ শক্তির ভয়াবহ প্রভাবের কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। একবার যদি দু একটা মৃত্যুর পশ্চাতে অশুভ শক্তির প্রভাবের কথা রটিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই কেল্লা ফতে। তারপর কোনো লোককে দিনের আলোতে খুন করলেও সাধারণে তার মধ্যে অলৌকিক শক্তির গোপন প্রভাব খুঁজে বেড়াবে। ডক্টর দীপঙ্কর বিশ্বাসের আকস্মিক মৃত্যুর পর মেনহেররার অভিশাপ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো। এই ফাঁকে ডাক্তার অগস্তিও হঠাৎ ধনবান হয়ে ওঠার একটা সুযোগ খুঁজে পেলেন আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি দীপঙ্কর বিশ্বাসের মৃত্যুতে বাইরের কেউ বিশেষ লাভবান হচ্ছে না। তবে রমেশ যোশীর কথা আলাদা। ভদ্রলোক অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক। তার ওপর অকৃতদার আমেদাবাদ পুলিশ উদয় যোশীর যে বৃত্তান্ত আমাদের কাছে পাঠিয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলো বিষয় ভালো করে ভেবে দেখার মতো। তার দাদা রমেশ যোশীর সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল না। তাহলে উদয় কোন সাহসে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে মিশরে এসে উপস্থিত হয়েছিল? এখানে নিশ্চয় তার বৈমাত্রেয় দাদা ছাড়া এমন কেউ ছিল যার কাছে সে কিছু সাহায্য পাবার আশা রাখত। রমেশ যোশী তাঁর ভাইকে এক কপর্দকও সাহায্য করেননি। তাঁর ভাইয়ের হাতে বাড়তি কোনো টাকাকড়িও ছিল না। তাহলে সে মিশর থেকে দেশে ফিরে যাবার ভাড়া যোগাড় করল কোথা থেকে? মিঃ ভাটিয়ার কাছে জানতে পারলাম ডাক্তার অগস্তির সঙ্গে আগে থেকেই তার কিছুটা আলাপ পরিচয় ছিল। তখন থেকেই রহস্যটা ফিকে হতে শুরু করল ক্রমে ক্রমে।

—কিন্তু তোমার ব্যাখ্যাটা যেন বড় বেশি কষ্টকল্পিত! বড় বেশি সামঞ্জস্যহীন!

—এত উতলা হোয়ো না বন্ধু! সিতাংশু হাত নেড়ে আমায় থামিয়ে দিল—হালকা সুরে আমরা এমন অনেক কথাই বলে থাকি অপরে যার সুনির্দিষ্ট অর্থ ধরে নেয়। আবার এর উল্টোটাও ঘটে থাকে। গভীর কথা অনেক সময় হালকা ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টাই ঘটেছে। উদয় যোশী তার মৃত্যুকালীন চিঠিতে নিজেকে একজন কুষ্ঠরুগী হিসেবে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু কেউই সে কথা বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল, পাগলের প্রলাপ। প্রকৃত সত্য হচ্ছে উদয় মনেপ্রাণে নিজেকে একজন কুষ্ঠরুগী বলে বিশ্বাস করত।

কেন? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি

—এটা হচ্ছে ক্যাটল মনের চতুর আবিষ্কার। উদয়ের খুব সম্ভবত কোনো চর্মরোগ ছিল। অনেক সময় সামুদ্রিক জল হাওয়ায় এ জাতীয় চর্মরোগ দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার অগস্তি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাকে এটা কুষ্ঠরোগ বলে বুঝিয়েছিলেন।

অল্প থেমে আবার শুরু করল সিতাংশু—এখানে আসার পর প্রথম দুজনের ওপর আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে। একজন হচ্ছেন মিঃ বিশ্বনাথন, অপরজন ডাক্তার অগস্তি। মিঃ ভাটিয়াকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ রেখেছিলাম। কারণ এই সমস্ত খুনের ফলে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। পরে ভেবে দেখলাম, ডাক্তার অগস্তির পক্ষেই এই ধরনের খুনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি এবং সবার চোখের সামনে তিনি এই জাতীয় ঘটনাগুলোকে অন্যভাবে উপস্থিত করতে পারবেন। আরও একটা ব্যাপারে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। ডাক্তার অগস্তির সঙ্গে উদয় যোশীর পূর্ব পরিচয় ছিল। সে নিশ্চয় ডাক্তারের অনুকূলে কোনো উইল করে গিয়ে থাকবে। ডাক্তারও হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠার একটা পথ দেখতে

প্রাচীন মিশরে কি বিজ্ঞান ছিল না?

পেলেন। কাটা আঙুলে কোনো বিষাক্ত জীবাণু মিশিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় রমেশ যোশীর মনোগত অভিপ্রায় যাই থাকুক না কেন, তিনি যে তখনও পর্যন্ত কোনো উইল করেননি সে কথা ডাক্তারের অজ্ঞাত ছিল না। এই অবস্থায় মারা গেলে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি একমাত্র নিকট আত্মীয় উদয় যোশীরই প্রাপ্য হবে। হপ্তাখানেক বাদে উদয় নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। এর পেছনেও ডাক্তার অগস্তির অদৃশ্য হাত সক্রিয় ছিল। তিনিই মিথ্যে করে উদয়ের মনে কুষ্ঠ রোগের আশংকা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

এই একটা ব্যাপারে আমি অবশ্য সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই। তবে প্রকৃত ঘটনাটা কল্পনা করে নিতে পারি। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কল্পনা প্রকৃত সত্য থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হবে না। মিঃ উইলিয়াম ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনি কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। হয়তো অগস্তির বিরুদ্ধে মারাত্মক কোনো প্রমাণও তাঁর হাতে ছিল। ডাক্তার অগস্তি বোধহয় সেটা টের পেয়েছিলেন। তাই আর দেরি না করে সুকৌশলে পথের কাঁটা সরিয়ে দিলেন। কিংবা অগস্তি হয়তো ভেবেছিলেন উদ্দেশ্যহীন আর একটা খুন করলে সকলের মনে মেনহেররার আতংক আরও বদ্ধমূল হবে। খুনীদের মানসিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটা কথা ভাল করে জেনে রাখ, অজয়। কেউ যখন একটা খুন করে সফল হয় তখন তার মনে আরও খুনের বাসনা জেগে ওঠে। এই রক্ততৃষা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। সেইজন্যেই আমি জয়ন্ত সম্পর্কে এত বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। আমি জানতাম একজন নৃশংস খুনী সারাক্ষণ তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুদূর কলকাতা থেকে এত দূরে মিশরের এই মরুভূমিতে ছুটে এসেছি। আজ নৈশ ভোজের সময় প্রেতলোকের দেবতা অ্যামিবাসের যে ছায়ামূর্তি তোমাদের সামনে উদয় হয়ে আবার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ওটা আসলে হাসানের। আমিই ওকে মুখোশ পরে ওই ধরনের অভিনয় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ডাক্তার অগস্তির ওপর এর কী প্রতিক্রিয়া ঘটে সেটা লক্ষ্য করাই ছিল আমার মূল অভিপ্রায়। দেখলাম তিনি সহজে ভয় পাবার পাত্র নন। এবং ভূত প্রেতে আমার অগাধ বিশ্বাস যে নিছক ভানমাত্র তাও তিনি মনে মনে আঁচ করে নিতে পেরেছিলেন। আমি তাঁকে সন্দেহ করছি বুঝতে পেরে পরবর্তী শিকার হিসেবে যে আমাকেই বেছে নেবেন সেটা অনুমান করে নেওয়া এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাঁকে সে সুযোগ দেবার জন্যে আমি তাঁর সামনেই হাসানকে ডেকে কফির কথা বলে দিলাম এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এগিয়ে এলেন।

অল্প থেমে সিতাংশু আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর রহস্যময় কণ্ঠে বলল–অসহনীয় উত্তাপ এবং কর্কশ বালুকণার বিরক্তিকর দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও আমার মেধা যে বিন্দুমাত্র শিথিল হয়ে পড়েনি, এটা তুমি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না।

সিতাংশুর ধারণা যে কত অভ্রান্ত দু এক দিনের মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। বছর দু তিন আগে উদয় যোশী মাতাল অবস্থায় এক অদ্ভুত ধরনের উইল করে। সেই উইলের অবিকল বয়ান হচ্ছে এই:

আমার সোনার সিগারেট কেস (যেটা তুমি একদিন খুবই পছন্দ করেছিলে), তা ছাড়াও পৃথিবীতে যা কিছু রেখে যাব (যা একটা বিরাট অংকের ঋণ ছাড়া বোধহয় আর অন্য কিছু হবে না), সে সমস্তই আমার অবর্তমানে আমার অকৃত্রিম বন্ধু (যে আমাকে একদিন পুরীর সমুদ্রে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল) ডাক্তার সুন্দরলাল অগস্তিকে দিয়ে যাচ্ছি।

যতদূর সম্ভব ঘটনাটাকে সাধারণের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত লোকে সম্রাট মেনহেররার নাম শুনলে আতংকে শিউরে ওঠে। সাধারণের বিশ্বাস, সমাধিমন্দির অপবিত্র করার জন্যেই সম্রাটের বিদেহী আত্মা এত বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল।

–সবচেয়ে আশ্চর্যের কী জান? সিতাংশু একদিন কথাচ্ছলে আমার কাছে গল্প করেছিল–মিশরীয় ধ্যান-ধারণা কিন্তু কোনো প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

[বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।]

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

নতুন ধাঁধা

[১] একটি ঘরে বসত করে
চোদ্দ গণ্ডা ছেলে।
ঘরের বাইরে হয় যে তারা
মুখে আগুন জ্বেলে॥
বল তো ধাঁধা চেলে?

–মৃদঙ্গভূষণ বিশ্বাস
নুড়িপাড়া, কৃষ্ণনগর
নদীয়া

[২] মাথা কাটলে সফল নয়
পেট বাদে মানে হয়।

–প্রশান্ত কুণ্ডু
সৈরা

[৩] জল ঘিরে অত
মুক্ত যদি হত
তবে বায়ু ছেড়ে
শত্রু আসে তেড়ে!

–বিভাংশু দত্ত
পল্লীশ্রী/আরামবাগ
হুগলী

[৪] নাকটি ধরে আলগোছে
দেখাই তাদের যাদের আছে।
জননীকে রেখে শেষে
খুঁজেই দেখ আশেপাশে॥

–বিভাস মুন্সী
আই. এস. এম
ধানবাদ

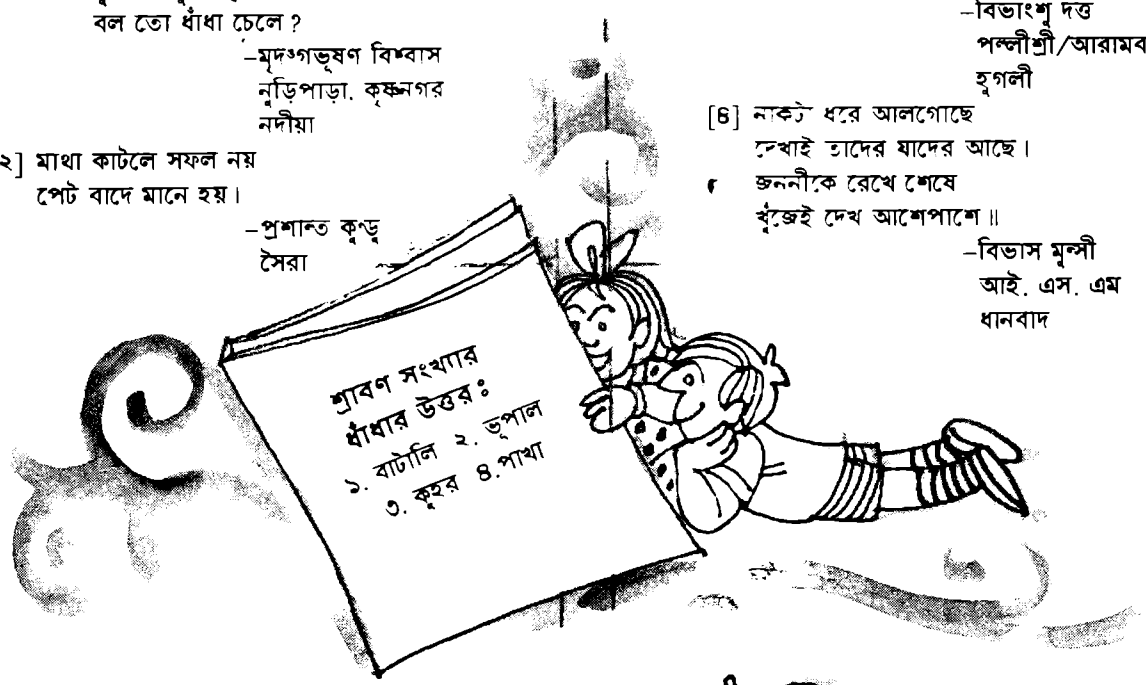

শ্রাবণ সংখ্যার শব্দমালার উত্তরঃ

পাশাপাশি

১. সানি ২. রামিজ রাজা ৫. কপিলদেব ৭. মার্শ ৮. কিরমানি
৯. ডিন ১০. লয়েড ১৩. বুন

ওপর-নিচ

১. সাদিক ৩. জাভেদ ৪. স্মল ৬. পিটার টেলর ৭. মার্টিন ক্রো
১০. শচীন ১২. ডন

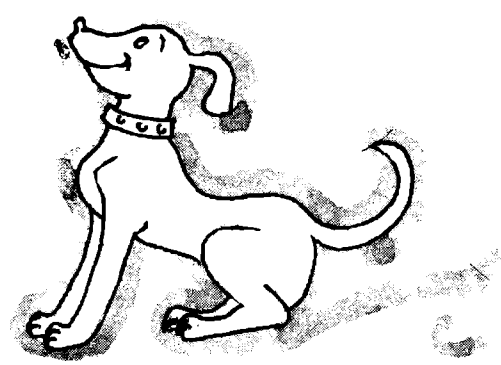

নতুন শব্দমালা

(সূত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেশের বা রাজ্যের সংকেত বা বর্ণনা দেওয়া আছে। উত্তরে ঐ দেশের বা রাজ্যের রাজধানীকে ধরতে হবে)

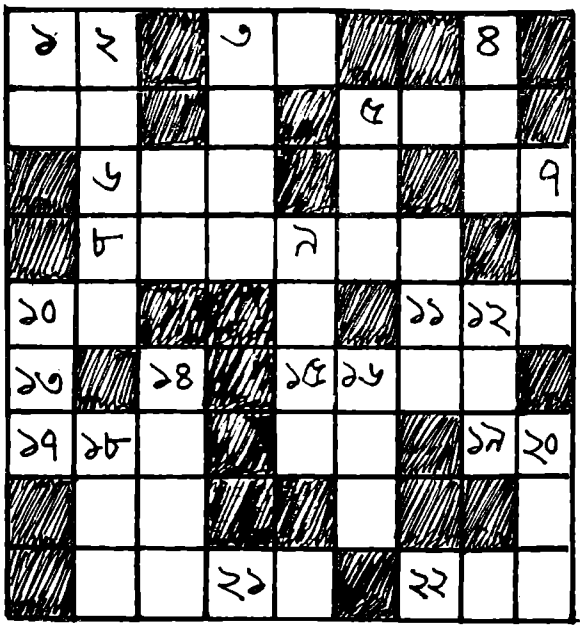

—এটি তৈরি করেছেন ঃ—

প্রিয়রঞ্জন সাহা
সিউড়ি/বীরভূম

পাশাপাশি

৩. পেরু নামেই ডাকে আমায়/পেরু নামেই চেনে আমায়।
৫. বরফ ঢাকা মাটি বেশি/আমেরিকার প্রতিবেশী।
৬. উল্টো দেখো কি বা ক্ষতি/সিহানুক রাষ্ট্রপতি।
৮. মঙ্গো দিয়ে আমার নাম/চীনের মাঝে অবস্থান।
১০. বিশ্বফুটবল চ্যাম্পিয়ন/এখন তার অন্য নাম।
১১. ৮৮-এর ওলিম্পিক/করেছি আমি ঠিক ঠিক।
১৫. সিরিয়া নাম/তেলের দেশে অবস্থান।
১৭. পাতার মতো দেশটা/পাকিস্তানের বর্ডারে তা।
১৯. টোগোল্যান্ড নাম জানি/লিখতে হবে রাজধানী।
২১. ভালো করে আবার শোনো/কপিল সানির দেশ জেনো।
২২. বলিভিয়া নামটি ঠিক/দেখতে হবে উল্টো দিক।

ওপর-নিচ

১. আফ্রিকার নাম/ ঘানা তার নাম।
২. ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপ জেনো/ গায়না নামটি মেনো।
৩. ইউসোবিও থাকেন যেথায়/ইউরোপের এক কোণায়।
৪. ঠিক মতো সব লিখতে হবে/বুলগেরিয়ায় যেতে হবে।
৫. চার দ্বীপের দেশ/দেখো প্রথমেই শেষ।
৭. ভারতমাতার বড় সন্তান/ঠিক মধ্যে অবস্থান।
৯. মরুভূমির দেশটা/সাদ্দামভাই তাদের নেতা।
১২. নিশীথ-সূর্য দেখা যাবে/মানুষ-রাস্তা মিলে যাবে।
১৩. বাংলা দিয়ে নামটি খাসা/বাংলা যার রাষ্ট্রভাষা।
১৪. কিসস্যা বিশ্বরেকর্ডকা/করেছিল প্রথম এখানে বুবকা।
১৬. মোনালিসার আদি দেশ/তিন অক্ষরে নামটি শেষ।
১৮. দেশের নারী সাবাতিনি/এয়ার্সটা শেষের ধ্বনি।
২০. সাজিয়ে গুছিয়ে লেখো/কাশ্মীরের নিচে দেখো।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥
শিবানী, শংকর, মাধুরী, বিপাশা ও অনন্যারা/মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট; তিস্তা, সুমন, বিল্টি, মামন ও পাপাই/সার্কাস অ্যাভিনিউ, পার্ক সার্কাস; নিপু, ঋতু, মনা, শিমাই, গগন ও বাচ্চু সরকার/অ্যাভিনিউ ফার্স্ট রোড, সন্তোষপুর, যাদবপুর;

॥ হাওড়া ॥
অনি, দীপ, বাধান, রিমি ও রিম্মি/দক্ষিণপাড়া, আন্দুল; পিনাকী বসু/বি. ই কলেজ, কোয়ার্টার্স, শিবপুর; তপতী, সান্ত্বনা, জোটন, মাধাই, বুড়ি ও তৃপ্তি মজুমদার/রামরাজাতলা;

॥ হুগলী ॥
সঞ্চারী ও মৌলীনা কুমার/বিষড়া; নুটু, বিকাশ, তপন ও দিশারী চৌধুরী/ফিরিঙ্গিডাঙা, শেওড়াফুলি

॥ ২৪-পরগণা ॥
মৌ, বুবুন, তাপি, সন্ধানী, নয়ন ও বাপী মুখোপাধ্যায়/নোনাচন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর; আশিস, তিলু, নিকিতা, বিবি ও জয়ন্তী নাগ/শ্যামনগর স্টেশন রোড, শ্যামনগর;

॥ বর্ধমান ॥
কল্যাণ, কাজল, সৌরভ, গৌরব লাভলী, গুড্ডু ও রঞ্জিৎ সরকার/বহুলা, বর্ধমান; অর্পিতা ও অন্তরা/ মিধাপুর কোলিয়ারী, শিহাড়সোল রাজবাড়ি; মামন, দাই, নিখিল ও রতন/ছোটনীলপুর;

॥ মেদিনীপুর ॥
স্বাতী, বোধিসত্ত্ব ও সোনামণি মাইতি/গ্রাম: কালিকাখালি, মঠচন্ডীপুর; কমল, কল্যাণ, টিসু, শ্রীপতি ও অশোক/হামিরপুর, রামনগর;

॥ বাঁকুড়া ॥
দিলীপ ও শিখা/পিরিংচক, রাইবাঘিনী; স্বপন, অর্চনা ও কৃর্চি সেনগুপ্ত/মলিয়াল; মিন্টন, কল্লোল ও মৌসুমী খাঁ/গ্রাম: মনোহর;

॥ পুরুলিয়া ॥
অরুণেশ, অন্বেষা ও অস্মিতা মুখার্জী/লাগদা; মৈনাক ভট্টাচার্য/লালমোহন ত্রিবেদী লেন, নীলকুঠি ডাঙা; কৌশিক ও বৈশাখী চৌধুরী/পুরুলিয়া, এস. সি. সেন রোড;

ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমিকস্ 'ডায়মন্ড কমিকস্'
প্রতি মাসে প্রকাশ করছে চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কী
আর ফ্যান্টমের নিত্যনতুন এবং
আকর্ষনীয় কান্ডকারখানা।

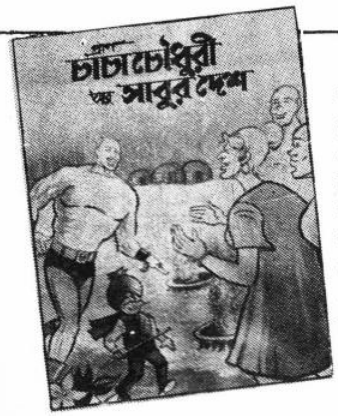

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী একজ ন বুদ্ধিমান মানুষ। উনি ওনার কম্‌পিউটারের চেয়েও প্রখর বুদ্ধির জোরে মুহুর্তের মধ্যে যে কোনও সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। জুপিটারবাসী অসীম শক্তিমান সাবু ওনার সাহায্যকারী। শক্তি আর বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে-এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

চঞ্চল, দুষ্টু পিঙ্কী কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি। পিঙ্কী, ওর দাদু আর ওদের প্রতিবেশী ঝপটজীর অদ্ভুত-অদ্ভুত কান্ডকারখানা তোমাদের তো আনন্দ দেবেই, অত্যন্ত গোমড়ামুখোদেরও হাসতে বাধ্য করবে।

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু তার সঙ্গীসাথী গাব্দু, জোজি আর বজরঙ্গী পালোয়ান-কে নিয়ে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য ইতিমধ্যেই বুকস্টলে হাজির হয়ে গেছে। আট থেকে আশী বছরের বাচ্চারাও সমানভাবে আনন্দ পাবে বিল্লুর মজার-মজার কান্ডকারখানা পড়ে।

সমগ্র বিশ্বে ১৫০ টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম-এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো সবার কাছে সমান মনো-রঞ্জনের পাত্র। প্রাচীন কাল থেকে বংশানুক্রমে অসহায়ের বন্ধু ও অপরাধীদের কাছে সাক্ষাৎ যমদূতের সৃষ্টিকর্তা শ্রী লী ফক, যিনি জনপ্রিয় ম্যান্ডেক-এরও সৃষ্টি করেছিলেন।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর নিবেদন

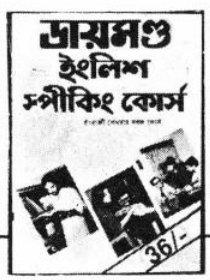

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর সগর্ব প্রকাশন-'ডায়মন্ড ইংলিশ স্পীকিং কোর্স'-যা আপনাকে ইংরাজী ঠিকমত বলতে না পারার হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। নিজের কাজ, ব্যবসায় ও বন্ধুদের সঙ্গে শুদ্ধভাবে ইংরাজীতে কথা বলে নিজের মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়ান।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর আরেকটি সগর্ব প্রকাশন-'ডায়মন্ড বেঙ্গলী লারনিং এ্যান্ড স্পীকিং কোর্স থ্রু ইংলিশ'-এই বইটি আপনাকে ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা 'বাংলা ভাষা' শিখতে সাহায্য করবে।

DIAMOND COMICS PVT. LTD.
2715. DARYA GANJ. NEW DELHI-2.

DISTRIBUTORS **VISHAL BOOK CENTRE** 4, TOOTI LANE, CALCUTTA-16

হাঁদা-ভোঁদার
ডিমের ডেলার্কি
আসছে ম্যাচে গোল করার জন্যে আমাকে হেড প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে!
আচ্ছা, ভোঁদা তাহলে হেড প্র্যাকটিস করছে!
ব্যাপার হচ্ছে যে এটা আমি কতক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবো? আমি গুণতে থাকি - এক-দুই-তিন-
তিন? এতো কম প্র্যাকটিসেই দম ফুরিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লি? কি করে হয়!
হিঃ হিঃ! ঠিক এইভাবে করতে হয়! একেবারে লক্ষ্যস্থলে ফেলা!
মরেছে এটা যে পিসেমশাইয়ের ঘরের জানলা!
কে র‍্যা, জানালার কাঁচ ভাঙলি? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা! এই যে, এই দ্যাখ!
ওঃ! পিসির কি টিপ রে মাইরি, ভোঁদা! না দেখেই লক্ষ্যভেদ!
পরে
আমি এবারে ব্যাল্যান্স প্র্যাকটিস করি।
আমি এটা বন্ধের ব্যবস্থা করছি।
এ আবার কি?
গেছি রে!

টিনের কৌটো দিয়ে এটাও তোর হেড প্র্যাক্‌টিস হলো রে, ভোঁদা!
গরর! দাঁড়া, আমিও তোকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি!
সেই মতো
ইয়ে—এই ডিমগুলি দিয়ে কি করে জাগলিং করতে হয় আমাকে দেখাতে পারবি, হাঁদা?
নিশ্চয়ই—একজন ওস্তাদের কাছে এসব সহজ ব্যাপার!
দেখেছিস? সোজা! যদি তিনটে দিয়ে এটা এতো সোজা—
—এবার চারটে দিয়ে চেষ্টা কর!
এঃ!
ওয়াফ্!
অ্যাই! এখানে তোদের হচ্ছেটা কি? অ্যাঃ!
ইয়ে—হাঁদা হেড করে ডিম জাগার ভেলকি দেখাচ্ছে, পিসেমশাই!
ইঁঃ! একদম পচা ডিম!
ডিমের ভেলকি? চল হতচ্ছাড়া মর্কট! বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমিও তোকে ভেলকি দেখাচ্ছি!
পিসেমশাই এখন গন্ধমাদন বহন করে নিয়ে যাচ্ছে! হাঃহাঃ!

আভারানী গৃহঠাকুরতা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কৃত গল্প

আমার মা

নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত

চারিদিক নিস্তব্ধ। একটু পরেই শুরু হবে পাখির কলরব, তারও কিছু পরে সূর্যিমামা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারবেন। কিন্তু এখনও সারা জঙ্গল নিদ্রায় আচ্ছন্ন। আমি উঠে পড়েছি। আমার দুধ চাই। মায়ের শক্ত পাটা কোনোরকমে ঠেলে ঠুলে উঠে পড়লাম। আমার অস্থিরতা মা আড়চোখে দেখে নিয়েছে। কিন্তু দুধ দিতে সে এখন রাজী নয়। লেজের ঝাপটায় সে বুঝিয়ে দিল এখনও সময় হয়নি। আমি তার পেটের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে পাখিদের কলরব শুরু হয়েছে। আমাদের গুহার দরজায় সূর্যিমামার স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে। আর একটু পরে সবুজ মাঠে একপাল হরিণের দল কচি ঘাস খেতে আসবে। মা আজ আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে বলেছে। কিন্তু আগে আমার দুধ চাই। মা হঠাৎ তড়াক করে উঠে পড়ল। নিজেকে একটু ঝেড়ে নিয়ে গুহার দরজার সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়াল। তার ডোরাকাটা গায়ে সূর্যিমামার আলো চমক দিয়ে উঠল–দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে। মা বোধহয় হরিণের পালের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে বাইরে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি মা ছুটতে শুরু করেছে। আমিও যতটা পারি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মায়ের এই দুধ না দেওয়ার স্বভাবটি আমার ভাল লাগে না।

প্রকৃতির আঙিনায় আমরা ছুটে চলেছি, ছুটে চলেছি ঐ নীল আকাশের তলায় ঐ সবুজ রঙে রাঙানো মাঠের দিকে। ছুটে চলেছি আশ্চর্য সুন্দর চিতলদের দিকে। মা যে কেন ওদের আঘাত করে গুহায় টেনে নিয়ে আসে বুঝি না, হয়তো আজ বুঝব।

সবুজ অরণ্যে পৌঁছে মা যেন থমকে দাঁড়াল। তারপর কাঁধ নিচু করে ঐ বড়বড় ঘাসের ঢেউয়ের মধ্যে ঢুকে গেল। তার নিঃশব্দ অথচ চলমান পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম। আর তার দৃঢ়তা। হঠাৎ মায়ের গতি বৃদ্ধি পেল। আমি মাকে ধরবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বড় বড় ঘাসের মধ্যে আমার পা পেঁচিয়ে গেল–আমি পড়ে গেলাম। শুধু দেখতে পেলাম ঐ ঘাসের মধ্যে দিয়ে আমার মা তীরবেগে ছুটে গেল। তারপর আমি উঠতে না উঠতেই এক গুড়ুম শব্দ সমস্ত অরণ্য কাঁপিয়ে তুললো। এই শব্দ সম্বন্ধে আমি মায়ের কাছে আগেই শুনেছি। শুনেছি এই শব্দ শুধু কান ফাটায় না, প্রাণও ফাটায়। মায়ের কথা ভেবে আমি চমকে উঠলাম। তারপর ভয়ে ভয়ে এখানে ওখানে মাকে খুঁজতে লাগলাম। তাকে দেখবার জন্যে আমার মন অধীর হয়ে উঠল। যেন মনে হলো মাকে কতদিন দেখিনি। পাগলের মতো খুঁজেও তার হদিস পেলাম না। চিৎকার করে মাকে ডাকলাম অনেকবার। কিন্তু আমার আর্তনাদ কি তার কানে পৌঁছচ্ছে না? যে মা এক ডাকেই ঘন জঙ্গল পেরিয়ে আমার কাছে ছুটে আসত, সেই মা আমার এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছে না! দুঃখ ও ক্ষোভে আমার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো বেদনায় সারা শরীর ও মন জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। তার খোঁজে সবুজ মাঠ ছেড়ে গ্রামের পথে এলাম। যদিও মায়ের বারণ আছে এই পথে আসা। দেখলাম এক বিরাট গাড়িতে আমার মাকে তোলা হচ্ছে। মায়ের ঐ সুন্দর পেলব হলুদ-কালো দেহ সান্ধ্য আকাশের লালচে রঙ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঐ তেজী মুখখানি আজ বেদনায় ভরা। ওরা আমার মাকে নিয়ে ঐ পথ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। শত চেঁচিয়ে আমি জানাতে চেষ্টা করলাম, "ওকে নিয়ে যেও না, ও আমার মা!" কিন্তু আমার কথা বাতাসে মিলিয়ে গেল, আমার অশ্রু ধূলায় মিশে গেল, ওরা থামল না

আভারানী গৃহঠাকুরতা স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

মায়ের জন্যে

রেবা ঘোষ

বাড়িতে অঙ্ক না করার অপরাধে অঙ্কের মাস্টার-মশাইয়ের হাতে রীতিমতো মার খেল আবদুল। কোনোদিন এরকম অবাধ্য হয়নি সে। রোজই সে অঙ্কের খাতা মাস্টারমশাইকে দেখায় কিন্তু হঠাৎ কেন যে তার ব্যতিক্রম ঘটল বুঝতে পারলাম না। ক্লাসের ছেলেরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। করবেই তো। আবদুল যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা একসঙ্গে স্কুলে

আসি, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই, আবার বাড়িতেও একসঙ্গে খেলা করি। সুতরাং প্রিয় বন্ধুর দোষ-গুণের ভাগ তো নিতেই হবে।

সেদিন ছুটির পর আবদুলের সঙ্গে দেখা না করেই বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে মনে মনে স্থির করলাম অবাধ্য বন্ধুর সঙ্গে আর মেলামেশা করা ঠিক নয়। যেমন করেই হোক ওর সঙ্গ ত্যাগ করতেই হবে। পরের দিন স্কুলে যাবার সময় আবদুলকে না ডেকে স্কুলে গেলাম। দেখলাম আবদুল স্কুলে আসেনি। মনে করলাম হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে, কিন্তু যখন পরপর সাত দিন আবদুলকে স্কুলে অনুপস্থিত দেখলাম তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। স্কুল থেকে আসার সময় আবদুলদের বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি আবদুল কতকগুলো গরু-বাছুর নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছে।

আমি আবদুলের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কিরে তুই স্কুলে যাসনি কেন?

আবদুল গরু বাঁধতে বাঁধতে বলল, রামু আমি আর পড়ব না রে। আমার বই নেই, খাতা নেই, পেন নেই, কি নিয়ে পড়া তৈরি করব বল। বাড়িতে বই, খাতা কিনে দিতে বললে মা বকুনি দেন, আর স্কুলে অঙ্ক না করতে পারলে মাস্টারমশায় মার দেন। সুতরাং আমার গরু চরানো ছাড়া আর কি উপায় আছে বল।

আমি আর আবদুলের দিকে তাকাতে পারলাম না। মাস্টারমশাইয়ের হাতে মার খাওয়ার ছবিটা মনের মধ্যে ফুটে উঠতেই আমার চোখে জল এসে গেল। আর দাঁড়াতে পারলাম না।

বাড়ি ফিরে মাকে সমস্ত ঘটনা বললাম। মা আবদুলকে খুবই ভালবাসতেন। আমার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে মা আমাকে বললেন, রামু, যা আবদুলকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি বাজার থেকে আসছি। এই বলে মা বাজারে বেরিয়ে গেলেন।

বাজার থেকে ফিরে মা আবদুলের হাতে তুলে দিলেন সপ্তম শ্রেণীর সমস্ত বই, পাঁচ দিস্তা কাগজ ও একটি পেন। মা ওকে বললেন, বাবা, এরপর থেকে পড়ার জন্যে তোমার যা কিছু দরকার আমাকে এসে বলবে, লজ্জা বা সংকোচ কোনোদিনের জন্যও তুমি মনে আনবে না। তোমার বন্ধুর মা মানেই, তোমারও মা।

আবদুল মাকে প্রণাম করে আনন্দে বইগুলি নিয়ে বাড়ি গেল।

ছবি :

এদের লেখাও ভাল :–

সুজাতা নাথ, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা ॥ মৈত্রেয়ী প্রধান, কাঁথি, মেদিনীপুর ॥ কাজল দাস, বনসাইগাঁও, আসাম ॥ সব্যসাচী চন্দ, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া ॥ আলো ঘোষ, কলকাতা–৯ ॥ পুষ্পেন্দুনারায়ণ লাহিড়ী, কলকাতা–৩৪ ॥ সৌরেন ঘোষরায়, মৌভান্ডার, সিংভূম ॥ মন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, আসানসোল–৪ ॥ শ্যামাপ্রসাদ গাঙ্গুলী, মানকর, বর্ধমান ॥ স্বাতী ব্যানার্জী, কলকাতা–১৫ ॥ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, হাওড়া–২১ ॥ শেখ আবদুল করিম, তালপুকুর, উঃ ২৪ পরগনা ॥ মানসচন্দ্র ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান ॥ সুশান্তকুমার ভট্টাচার্য, কাঁচড়াপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা ॥ পিনাকী সিন্‌হা, জলপাইগুড়ি–৭৩৫১০১ ॥ উজ্জ্বল ঘোষ, প্রতাপনগর, নদীয়া ॥ জয়ন্তকুমার সাহু, বড় সোলেমানপুর, মেদিনীপুর ॥ ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা–৬ ॥ শঙ্খ সরকার, ব্যান্ডেল, হুগলী ॥ সুচিত্রা সিংহরায়, চাতরা, হুগলী ॥ প্রণীতা ব্যানার্জী, কলকাতা–৩২ ॥ শেখ হাবিবুল হাসান, হাওড়া–২ ॥ অশোক বিশ্বাস, টিটাগড়, দঃ ২৪ পরগনা ॥ বিভাসকুমার সরকার, নতুনবাটি, বাঁকুড়া ॥ ছায়া রায়, রাঁচি–১ ॥ উদয়শঙ্কর চক্রবর্তী, ভৈরবনগর আসাম ॥ আনন্দসম্রাট চক্রবর্তী, হরিনাভি, দঃ ২৪ পরগনা ॥ স্বপনকুমার প্রামাণিক, হ্যানুভ্ঞ্যা, মেদিনীপুর ॥ সুদীপ্ত সরকার, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর ॥ শংকর চক্রবর্তী, কলকাতা–৮ ॥ সন্দীপ্ত মজুমদার, হালিশহর, উঃ ২৪ পরগনা ॥

ঘোষণা

আন্দুল পূর্বপাড়া, আন্দুল মৌড়ি, হাওড়া থেকে অচিন্ত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রয়াত পিতা কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের নামে একটি স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা চাইছি।

জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, মৃত্যু : ৯ ডিসেম্বর ১৯৯০

বিষয়বস্তু

এই শরতে

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ কার্ত্তিক।

পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার : ৫০ টাকা ॥ দ্বিতীয় পুরস্কার : ৩০ টাকা।

ককেশাশের কোলা

আরতি বসু

ভারি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন জিওর্জি কাকা। একা একা থাকতেন ককেশাশ পর্বতের ঢালে বনজঙ্গল ঘেরা একটা কুঁড়েঘরে। বাঘ না থাকলেও বুনো শুওর, ভালুক তো ছিলই সেখানে। তা সেজন্যে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না জিওর্জি কাকার। কারণ তিনি খাবার হাতে নিয়ে ডাকলেই গাছ থেকে পাখিরা নেমে আসত, গর্ত থেকে শেয়াল বেরিয়ে আসত, পুকুরের তলা থেকে বুড়ো ঈল মাছ ভেসে উঠত পাড়ের কাছে। ছানাপোনা নিয়ে হরিণরাও আসত আর বুনো শুওর সাবধানে পাশ কাটিয়ে চলে যেত যাতে তাঁর গায়ে তার দাঁতের খোঁচা না লাগে। শুধু পশুপাখি কেন জঙ্গলে কাঠ কাটতে আসা কিংবা মধু খুঁজতে আসা গ্রামবাসীরাও যখন তখন ঢুকে পড়ত তাঁর কুঁড়েতে, ফলমূল রুটি মধু দিয়ে জিওর্জি কাকা তাদের আপ্যায়ন করতেন, জমিয়ে গল্প করতেন। আবার পাথরের কাজও তাঁর এত ভাল জানা ছিল যে ইচ্ছে করলেই শহরে গিয়ে অনেক রোজগার করতে পারতেন, কিন্তু করতেন না। পাহাড়ের ওপরেই সামান্য ফলমূল শাকসব্জী ফলাতেন, হাঁস-মুরগী-মৌমাছি পুষতেন। একা মানুষের বেশ চলে যেত।

এই জিওর্জি কাকার আদরের ভাইপো জর্জ। প্রায়ই সে পাহাড়ের নিচের গ্রাম থেকে ওপরে উঠে আসত। বনেজঙ্গলে ছুটোছুটি করত, কাকার কাছে গল্প শুনত, বাড়ি ফেরার সময় এটা সেটা নিয়ে ফিরত। যেবার ওর দশ বছর বয়স পূর্ণ হলো সেবার সক্কালবেলা খবর পেল কাকা ডাকছেন। কী না কী একটা দারুণ উপহার এনে রেখেছেন ওর জন্যে। নাচতে নাচতে ছুটল জর্জ। বিকেলে ফিরল যখন, তখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজাজয় করে এসেছে। হবে না? ও যে এখন একটা সত্যিকারের জ্যান্ত ভালুকছানার মালিক। দশ বছরের জন্মদিনে কাকা ওকে এই ভালুকছানাটা উপহার দিয়েছেন। ছানাটার মা নাকি কদিন আগে শিকারীর গুলিতে মারা গেছে। বেচারা বনের মধ্যে মরা মায়ের পাশে বসে বসে কাঁদছিল, জিওর্জি কাকা দেখতে পেয়ে তুলে এনেছেন। জর্জ যে কী খুশি হয়েছে বলবার নয়। কাকাকে বলে এসেছে যে ওর নাম রাখবে কোলা। ওকে যত্ন করে নাওয়াবে, খাওয়াবে, লোম আঁচড়ে দেবে, একটুও অবহেলা করবে না।

বাড়িতে ফিরে কিন্তু জর্জের আনন্দ মিইয়ে গেল। কোলাকে দেখে বাড়ির অন্য পুষ্যিগুলো খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। বেড়ালরা দেখেও দেখল না, মোষ দুটো খেতে খেতে একবারের জন্য মাথা তুলে একটু কান ঝাড়া দিয়ে আবার খাবারে মন দিল। ওর টাট্টু ঘোড়া চাল্লা তো পা ঠুকে ঠুকে দাঁত খিঁচিয়ে বুঝিয়েই দিল যে সে বিরক্ত হয়েছে। অগত্যা কোলাকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল জর্জ। হপ্তাখানেক কাটবার পর দেখা গেল কোলা আস্তে আস্তে ওদের মন জয় করে নিচ্ছে। কেবল হিংসুটে হাঁসগুলো ওকে সহ্য করতে পারত না। একদিন বাগে পেয়ে লেজ কামড়ে হিড়হিড় করে এমন টান দিল যে কোলা বেচারা কাঁউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জর্জের বিছানার তলায় গিয়ে লুকোল কোলা আর একটু বড় হবার পর এ ঝামেলাটাও কমে এল তখন আবার নতুন করে ঝামেলা বাধালেন পাড়াপড়শীরা বাড়ি বয়ে এসে তাঁরা জর্জের বাবাকে ভয় দেখিয়ে গেলেন, করেছেন কী মশাই? কোনদিন দেখবেন রাক্ষুসে ভালুকটা আপনার ছেলেমেয়েকেই খেয়ে বসে আছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন আপদ বিদেয় করুন।

তাঁরা চলে যাবার পর জর্জের বাবা জর্জকে ডেকে বললেন, পাড়াপড়শীরা ভয় পাচ্ছে কাজেই কোলাকে যদি বাড়িতে রাখতে চাও তাহলে ওকে এখন থেকে শান্তশিষ্ট হতে শেখাও। যেন কক্ষনো কাউকে ভয়টয় না দেখায়।

সেদিন থেকে উঠেপড়ে লেগে গেল জর্জ। রাতদিন বকবক করছে কোলার সঙ্গে, দুষ্টুমি করতে নেই, নোংরা হয়ে থাকতে নেই, অন্যের খাবার খেতে নেই, কাউকে দেখে গরগর করতে নেই, খেলার সময়ও কাউকে কামড়ে দিতে নেই। কোলা কী বুঝত কে জানে তবে অবাধ্যতা করত না। বরং জর্জ যে সব আদবকায়দা, ও মজার মজার খেলা শেখাতে চাইত, সেগুলো শিখে নিত চটপট। সে একটা করে নতুন কিছু শেখে আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে জর্জ খবর পাঠায় কাকার কাছে, জানো কাকা, কোলা এখন 'বাও' করতে শিখে গেছে....হ্যান্ডশেক করতে আর ভুল হচ্ছে না ওর....আজ কুস্তি কুস্তি খেলা খেলেছে আমার সঙ্গে....কোলা এখন আমার সঙ্গে সমানে সাঁতার কাটে....যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার সময়েও কাউকে লাগিয়ে দেয় না....ও যে কী সুন্দর নাচতে শিখেছে–দেখলে তুমি অবাক হয়ে

যাবে....ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তরে জিওর্জি কাকা বারবার জর্জকে মনে করিয়ে দেন, জন্তুজানোয়ারকে ছোট চোখে দেখতে নেই। তুমি যে ওকে দয়া করে দেখাশোনা করছ এমন কক্ষণো ভাববে না। অন্য বন্ধুদের মতো কোলাকেও একজন বন্ধু বলেই ভাববে। জর্জ তাই ভাবত। কোলা নিজেও বোধহয় নিজেকে সেইরকমই কিছু একটা ঠাউরেছিল। তাই দিনদিন তার মাতব্বরি বাড়ছিল। সেইসঙ্গে ছিল তার সব বিষয়ে কৌতূহল। গাছের গায়ে প্রজাপতিটা বসে বসে কী করছে, খুঁটিতে দড়িটা কেন বাঁধা আছে, রাস্তার ধারে উল্টোনো ঝুড়ির তলায় কী আছে, ঘণ্টা কেমন করে বাজে—সব ওর জানা চাই, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা চাই। এই করতে গিয়ে একদিন একটা গোলমাল বাধিয়ে ফেলল কোলা।

জর্জদের গ্রামে কোথাকার কোন এক জমিদারের মস্ত বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। অনেক মিস্ত্রী মজুর খাটছিল সেখানে। তাদের সঙ্গে কোলাও মাঝে মাঝে ভারায় উঠে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখত। এই করতে গিয়ে একদিন সে ছিটকে পড়ল ভারা থেকে। এত জোর চোট পেল যে এক সপ্তাহ হাঁটতেই পারল না। ঠিক তারপর আবার হৈচৈ। একজন ছুতোর নাকি তার যন্ত্রপাতি খুঁজে পাচ্ছে না। আগের দিন কাজের পর গুছিয়ে তুলে রাখেনি, বাস, সব গায়েব। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর এখান সেখান থেকে একটা একটা করে সব বেরুল, শুধু বড় হাতুড়িটা পাওয়া গেল না। ছুতোর তো গ্রামবাসীদের চোরটোর বলে যা-তা অপমান করল। সেদিন বাড়ি ফিরে জর্জ দেখে কোলা তার পড়ার টেবিলের পাশে হাতুড়িটার ওপর চেপে বসে একমনে লম্বা লম্বা নখ দিয়ে দাঁত খুঁটছে। বকে ধমকে তার কাছ থেকে হাতুড়ি কেড়ে নিয়ে জর্জ যখন ফেরৎ দিতে গেল তখন অন্য মিস্ত্রীরা ছুতোরকেই দোষ দিতে লাগল। বলল, ছুতোরই নাকি আগে কোলার পিছনে লাগতে শুরু করে এবং সেই নাকি ভারার ওপর আলগা কাঠ রেখে কোলাকে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। শুনে জর্জ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, কোলা আগ বাড়িয়ে অন্যায় করেনি কিছু।

অন্যায় যেটা কোলা একদিন করে ফেলেছিল সেটাও অন্যায় ভেবে করেনি, খেলা ভেবে করেছিল। সেদিন পাড়ার একটা বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে সে ঝর্নার জলে হাপুস হুপুস করে স্নান করিয়ে দিয়েছিল। বাচ্চাটার মা তো কেঁদেকেটে একশা। জানতে পেরে জর্জ ছুটল। কিন্তু, কী আশ্চর্য! কোলার কাছ থেকে কেড়ে নিতেই বাচ্চাটা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। শেষে আবার ফিরিয়ে দিতে হলো কোলার কাছে, আবার খানিক জল ছোঁড়াছুঁড়ি হলো তার সঙ্গে, তবে সে চুপ করল।

এরপর আর কোনোদিন গ্রামের কারুর সঙ্গে কোলার কোনো গোলমাল হয়নি। বরং শহর থেকে আসা একদল বদ-মেজাজী অফিসারকে পিটুনি দিয়ে সে সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কেউ তাকে ভয় পেত না, কচি বাচ্চার মায়েরাও নয়।

কোলার বয়স যখন ঠিক ছয় তখন জর্জদের গ্রামে একটা সার্কাসের দল এলো। সে দলে সিংহ আছে, বাঁদর আছে, ছাগল আছে, কুকুর আছে। একজন বাজীকরও আছে। সবাই খেলা দেখায়। দারুণ সব খেলা। প্রথম দিনই কোলাকে নিয়ে সার্কাস দেখে এল জর্জ। পরদিন ভোর হয়েছে কি হয়নি গুটিগুটি পায়ে জর্জ গিয়ে হাজির হলো সার্কাসের তাঁবুর কাছে। সঙ্গে কোলা। সার্কাসের মালিকের নাম ভান্নো। ওদের দেখতে পেয়ে ভান্নো কাছে ডাকল, বলল, আমাকে একটু সাহায্য করবে? জর্জ কোলা দুজনেই খুশি। ভান্নোর সঙ্গে ওরা জল তুলল। চারদিক পরিষ্কার করল। সিংহ-বাঁদর-ছাগল-কুকুর সব্বাইকে খেতে দিল। তারপর নিজেরা খেতে বসল। একথা ওকথার পর ভান্নো জিজ্ঞেস করল, তোমার কোলা কুস্তি করতে কিংবা নাচতে পারে? জর্জ বলল, সব পারে, দেখ না। কোলাকে ইশারা করতেই শান্ত সুবোধের মতো সে তার সব বাহাদুরিগুলো দেখিয়ে দিল। ভান্নো মহা খুশি। সে বলল, এত ওস্তাদ তোমার কোলা, আর ও কিনা এই গ্রামে পড়ে আছে! ওকে আমাকে দাও। দেখবে ও একদিন কী দারুণ সব খেলা দেখাচ্ছে।

জর্জ খাবার ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, কক্ষণো না। আমার কোলাকে আমি কাউকে দেব না।

ভান্নো ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল, বলল, শোন একটা কথা বলি। ওর জন্য আমি তোমাকে দেড়শ রুবল দেব।

জর্জ আবার রেগে গেল, কিছুতেই না, দেড় হাজার রুবল দিলেও না।

ভান্নো দুঃখিতভাবে বলল, তাহলে আর কি হবে! তবু আমার ঠিকানাটা রেখে দাও। দেশে যুদ্ধ লাগবে বলে মনে হচ্ছে। যদি সত্যিই যুদ্ধ লাগে আর কোলাকে নিয়ে অসুবিধেয় পড়ো তাহলে আমার কাছে চলে এস।

সার্কাসের দল গ্রাম ছেড়ে যেতে না যেতেই যুদ্ধের কালো ছায়া নামল দেশ জুড়ে। কয়েক মাসের মধ্যে গ্রামের অনেকে চলে গেল যুদ্ধে যোগ দিতে। গেল নয়, যেতে হলো। রাজার হুকুম। পরের বছর জর্জের পালা যখন এলো তখন গ্রামে পুরুষ-মানুষ আর নেই বললেই চলে। বাচ্চা, বুড়ো আর মেয়েরা ছাড়া সবাই যুদ্ধে চলে গেছে। খাবার-দাবার পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক মতো। এই অবস্থায় কোলাকে কার কাছে রেখে যাবে জর্জ? জিওর্জি কাকাও নেই, তিনিও যুদ্ধে গেছেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে জর্জ ঠিক করল সার্কাস মালিক ভান্নোর কাছে যাবে কোলাকে নিয়ে। না, বিক্রি করবে না। যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত রেখে দেবে তার হেফাজতে। কারণ জর্জ বুঝতে পেরেছে ভান্নো জন্তুজানোয়ারদের অযত্ন করে না।

ওদের দেখে হৈহৈ করে উঠল ভান্নো, আরে, এসো এসো। এতদিনে বুদ্ধি খুলেছে তাহলে? খুব ভাল, খুব ভাল।

চোখভর্তি জল নিয়ে জর্জ বলল, না ভান্নো, কোলাকে আমি কিছুতেই বিক্রি করতে পারব না। শুধু আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে না আসা অবধি ওকে তুমি রাখ—এইটুকু অনুরোধ।

ভান্নোর চোখেও জল এসেছিল। সে জর্জের পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি ভেব না। কোলা আমার কাছে আরামে থাকবে।

ভান্নোর কাছ থেকে বিদায় নিল জর্জ। কিন্তু কোলার কাছ

থেকে বিদায় নেওয়া সহজ হলো না। কোলা কিছুতেই থাকবে না সেখানে। জর্জ ওকে অনেক বোঝাল, অনেক আদর করল, যুদ্ধে যাওয়ার হুকুমনামাটা পড়ে শোনাল, ভান্নোর কাঁধে ওর দুই থাবা তুলে দিয়ে বোঝাল ভান্নোও একজন বন্ধু। তবু না। কোলা কিছুতেই থাকবে না সেখানে। শেষে ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চেন দিয়ে বেঁধে ফেলল ভান্নো। জর্জের তখন আর পিছন ফিরে দেখার মতন মনের অবস্থা ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে প্রায় ছুটে পালাল সে।

কুড়ি মাস ধরে যুদ্ধ করার পর পনেরো দিনের ছুটি পেল জর্জ। পেতেই ভাল করে স্নান করে পরিষ্কার পোশাক পরে রওনা দিল ভান্নোর বাড়ির দিকে। কোলাকে নিয়ে আসবে সে। এই পনেরোটা দিন ওকে নিয়ে থাকবে নিজেদের বাড়িতে।

কিন্তু কোথায় ভান্নো! জর্জ দেখল ওর বাড়ির জানলা বন্ধ, দরজায় তালা দেওয়া! জর্জকে দেখে এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী এগিয়ে এসে জানাল, ভান্নোও যুদ্ধে গেছে মাস দুয়েক আগে। ওর বুড়ো সিংহটা মরে গেছে। গাধা আর কুকুরগুলো গ্রামের অন্য লোকেদের বাড়িতে আছে। বাঁদরগুলোকে নিয়ে গেছে বেদেরা। আর কোলা? তাকে তো ভান্নো সঙ্গেই নিয়ে গেছে। কোথায় তা বাপু জানি না।

হতাশ জর্জ ভান্নোদের গোটা গ্রাম, গ্রামের আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজল। নেই, কোথাও নেই কোলা। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ধীর পায়ে বাড়ির পথ ধরল জর্জ। একটু করে পথ চলে আর চারদিকে দেখে, যদি দেখতে পায় তার কোলাকে। পেল না।

দেখতে দেখতে ছুটি ফুরিয়ে গেল। ফিরে যাবার আগে ছুটিতে আসা অন্য সৈনারা ঠিক করল একটা দিন সবাই মিলে বনের ধারের সরাইখানায় গিয়ে একটু আমোদআহ্লাদ নাচগান করবে। জর্জের মন একেবারেই ভাল ছিল না। তবু সে ওদের সঙ্গে যোগ দিল। সারাদিন সবাই হৈহৈ করল। জর্জ শুধু একা একা বসে রইল এককোণে। কিছু ভালো লাগছে না তার। সন্ধ্যের মুখে এক কাপ কফি চাইল জর্জ। সরাইখানার ছোকরা চাকরটা শুনতে পায়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ যেন জর্জ ক্ষেপে উঠল। প্রচন্ড জোরে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল সরাইখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। প্রথমটা থমকে গিয়েছিল সবাই। তারপর চমক ভাঙতে না ভাঙতেই আবার থমকে গেল। এবার জর্জ নয়, গর্জন করছে একটা ভয়ংকর বুনো জানোয়ার। ভয়ে কে কোথায় পালাবে ঠিক করতে পারছে না। শুধু জর্জ হাসছে হাহা করে, পাগলের মতো। সে ঠিক চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এ তার কোলার গলা।

সত্যিই কোলা এসেছে। যুদ্ধে যাবার আগে ভান্নো কোলাকে ককেশাশেরই বনের ধারের এই সরাইখানার মালিকের কাছে রেখে গিয়েছিল। বলে গিয়েছিল, তোমার কাছে একে রাখ। ভয় নেই, এ খুব শান্ত, কোনো ক্ষতি করবে না তোমার। এর এক ভাই আছে, সেও যুদ্ধে গেছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে সে নিয়ে যাবে একে। সত্যিই এতদিন জর্জের অপেক্ষায় বসেছিল কোলা। আজ তার গলা পেতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কুড়ি মাস পরে দেখা! সরাইখানার লোকজন পালিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। দুজন দুজনের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আদর করছে।

সেদিন অনেক রাত অবধি দুজনে একসঙ্গে রইল। শেষে কোলা ঘুমিয়ে পড়তে জর্জ বাড়ি গেল। পরদিন সকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আবার সরাইখানায় এল। যাবার আগে আর একবার কোলার সঙ্গে দেখা করে যাবে। এসে দেখে সেখানে সবাই হতভম্ব হয়ে বসে আছে। চারদিকে ভাঙা কাপ প্লেট চেয়ার টেবিল ছত্রাকার।

কী ব্যাপার? জিজ্ঞেস করল জর্জ।

সরাইখানার মালিক বলল, সকালে উঠে আপনাকে দেখতে না পেয়ে আপনার কোলা এত রেগে গিয়েছিল যে এই কান্ড করেছে। আমরা চেন দিয়ে বাঁধতে গিয়েছিলাম। তা আমাদেরও মেরে ধরে চেন ছিঁড়ে দিয়ে বনে চলে গেছে।

জর্জ বুঝল প্রচন্ড অভিমান হয়েছে কোলার। সবাইকে বুঝিয়ে শান্ত করে সে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল জঙ্গলের পথ ধরে। একটু যায় আর কোলার নাম ধরে ডাকে। অনেকক্ষণ পর কোলা এল। জর্জ দেখল রাগ, দুঃখ, অভিমান কী নেই কোলার চোখে! কোলাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল জর্জ। কাঁদতে কাঁদতে বলল, বুঝলি কোলা, যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। কিন্তু উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে। তুই এখানেই থাক, এই বনের মধ্যে তোর আপনজনদের কাছে। আমি যদি ফিরে আসি, আবার দেখা হবে। কোলাও তার নিজস্ব ভঙ্গিতে অনেক কথা বলল। বুঝিয়ে দিল জর্জকে না দেখে সে থাকতে পারে না। মানুষ কেন মিছিমিছি যুদ্ধ করে? কেন শুধু শুধু কষ্ট পায়?

ওরা দুজন কেউ জানে না এর উত্তর। শুধু জানে কোনো দোষ না থাকলেও যুদ্ধের যা কিছু দুঃখ সব বহন করতে হবে ওদের। এক সময় জর্জ উঠে দাঁড়াল। কোলার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের পথ ধরল। কোলা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একসময় সেও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো ককেশাশের গভীর জঙ্গলে।

ওদের দুজনেরই আশা আবার দেখা হবে।

[জর্জ ও হেলেন পাপানভিলি রচিত 'কোলা দ্য বিয়ার' অবলম্বনে।]

ছবি : সুফি

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

চুল নিয়ে সমস্যা ?

চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

ডাঃ সরকার বলেন–

চুলের কোনও রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই শুধু মাথায় ওষুধ লাগালেই হবে না সঙ্গে ওষুধ খেতেও হবে।
খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান, আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধকরে, চুলের পুষ্টি জোগায়, অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়, চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়, আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

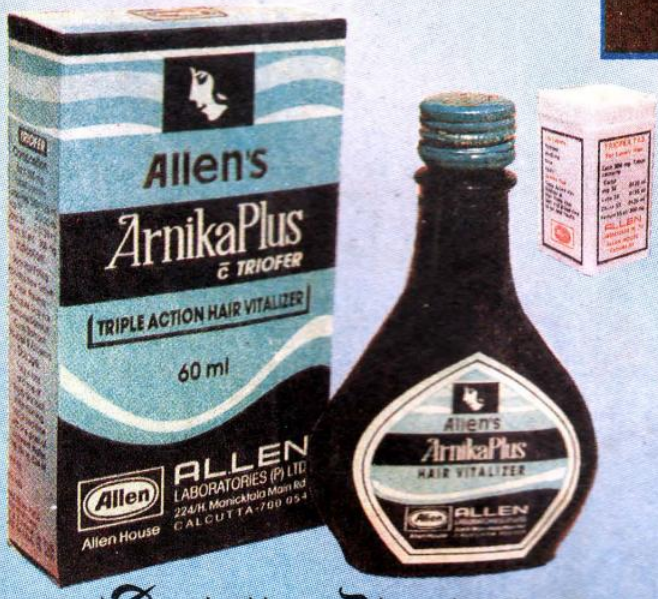

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপল অ্যাক্শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হোমিও ওষুধ

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন ৩৫-২৯৬১
এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ
এ্যালেন হাউস ঃ ২২৪/এইচ, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

বিশ্বে সর্বপ্রথম

কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ আবিষ্কার (সি,সি, আই-পুরস্কৃত)
ট্রায়োফার খাওয়ার সঙ্গে
আর্ণিকাপ্লাস লাগানোর ওষুধ।

ব্যবহার বিধি ঃ
আর্ণিকাপ্লাস-হেয়ার ভাইট্যালাইজার স্নানের পরে ও রাতে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় লাগান, সঙ্গে ট্রায়োফার-হেয়ার টনিকটিও-সেবন করুন সকালে ও রাত্রে, যত দিন না চুল নিয়ে সমস্যা দূর হয়।

বিপণন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১
অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ
আর্ণিকাপ্লাস অ্যাপার্টমেন্ট, শিয়ালদহ
৩৫, এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic Medicine Manufacturers

Bringing Science To Life

Dr. SARKAR Group

Allen's Ad. India

এসে গেছে প্রাণচাঞ্চল্যের দিন!

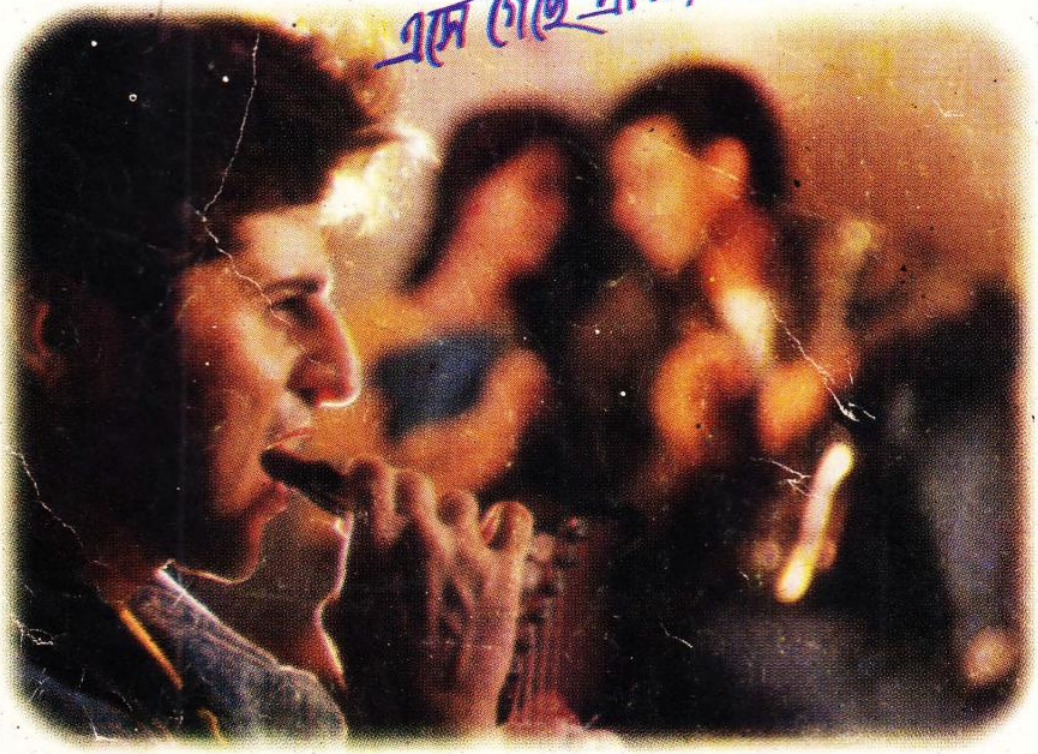

টারো!
অফুরন্ত শক্তির উৎস
এই সেই মিল্ক চকোলেট যেটি দুধের গুণে সমৃদ্ধ ও
পুষ্টিতে ভরা।
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা চকোলেট!

Campco

ভারতের বৃহত্তম, সব চেয়ে আধুনিক প্লান্ট। ক্যাম্পকো লিমিটেড, ম্যাঙ্গালোর,

R K SWAMY/BBDO CL 10101 BNG